কাশ্মীর

(৬৯ খানি ছবি সম্বলিত)

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, পক্ষে শ্রীমনোতোষ
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : আগষ্ট, ১৯৫৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৫৮

শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক
বঙ্গবাসী লিমিটেড,
২৬নং, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯,
হইতে মুদ্রিত। (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

মূল্য ৪৷৷৹ সাড়ে চার টাকা।

শ্রীঅনন্তলাল চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভ্রমণ :

Russia To-day—৩৲

Himalayas in & across—২৲

রাশিয়া ভ্রমণ—১।০

পশ্চিম প্রবাসী—৪॥০

তুষারতীর্থ অমরনাথ—১॥০

গল্প :

কাঁটা—১॥০

অগ্রগতি—১।০

মাটীর পুতুল—১৲

নাটক :

ভুল—১৲

দৈবাৎ—।০

রক্ত তিলক—২৲

সম্ভবামি যুগে যুগে—২॥০

ছন্দপতন—

বিবিধ :

Banker's Guide—৮৲

Modern Agriculture—৸০

দুধের ব্যবসা—১॥০

চিত্রে রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস—৸০

স্বামিজী ও সাম্যবাদ—।০

পথনির্দেশ—।০

কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট ও হিন্দুমহাসভা—।০

নিবেদন—

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীর যাই। ডিসেম্বরে লিখতে স্থুরু করি এই ভ্রমণকাহিনী ও শেষ করি ১৯৫৩ সালের জানুয়ারীর শেষে। তারপর কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে ঘটনার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘোটেছে। এ কাহিনী মাসিক 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয় ১৩৬০ সালের পৌষ থেকে ১৩৬২ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত, কাজেই প্রুফ দেখার সময় সম্ভবমত পরিবর্ত্তন কোরেছি। পূর্ব্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবহুল্লা সম্বন্ধে ১৯৫২ সালে যা লিখেছিলাম কালের চক্র তা সত্য বোলে প্রমাণিত কোরেছে। ছবিগুলির জন্যে শ্রীপ্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে ঋণী। সময়াভাবের জন্য বইটীতে যে সব ছাপার ভুল থেকে গেছে তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি। ইতি—

১লা আগষ্ট, ১৯৫৫

৩১ একডালিয়া রোড,
কলিকাতা-১৯।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

কাশ্য’মীর

বিশ্বজনের মনোহারিণী কাশ্মীর, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, মহামুনি কাশ্যপের সৃষ্টি কাশ্যপমীর, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের বিভিন্ন সংস্কৃতির লীলাভূমি কাশ্য’মীর আজ আর শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-পিপাসু পূজারীদেরই আকর্ষণের বস্তু নয়, আজ তা’ সৃষ্টি কোরেছে জটিল রাজনৈতিক আবর্ত্ত ভারতে ও ভারতের বাইরে।

কাশ্মীর সমস্যার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য আজকের কাশ্মীরের আভ্যন্তরীন সত্য পরিচয় জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে দু’বার কাশ্মীর গিয়েছি; একবার তুষারতীর্থ অমরনাথের যাত্রী হিসাবে, আর একবার সৌন্দর্য্যপিপাসু ভ্রমণকারীর মন নিয়ে; কিন্তু এবার গেলাম প্রধানতঃ বর্ত্তমান কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থার সত্য পরিচয় জানবার জন্যে।

কাশ্য’মীর রাজ্যের মোট আয়তন প্রায় ৮৭৪৭২ বর্গমাইল, গ্রেট বৃটেনের চেয়ে কিছু ছোট কিন্তু ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য ছিল। মহীশূর গোয়ালিয়র বিকানীর রাজ্যগুলির একত্রিত আয়তনের চেয়েও কাশ্মীরের আয়তন বেশী; বোম্বাই প্রদেশের

হু' তৃতীয়াংশের প্রায় সমান। কাশ্মীরের উত্তরের যে অধিত্যকা ভূমিতে রাজধানী শ্রীনগর—তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪ মাইল, প্রস্থ ২৪ মাইল, তার উচ্চতা ৫০০০ থেকে ৬০০০ ফিট। এই উপত্যকার প্রায় চারিদিকই অবিচ্ছিন্ন অভ্রভেদী পার্বত্য-তরঙ্গে বেষ্টিত, উত্তরে তুষার ধবল নাঙ্গা পর্বত (২৬৬২০ ফিট) অমরনাথ (১৭৩২০ ফিট), হরমুখ (১৬৯০০ ফিট), দক্ষিণে পীরপঞ্জল (১৫০০০ ফিট), পশ্চিমে কাজীনাগ (১২১২৪), পূর্বে বিশাল হিমালয়ের বিভিন্ন শিখর।

ইউরোপে সুইটজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খ্যাতি যে যে কারণে, কাশ্মীরেও ঘটেছে তার অপূর্ব সমন্বয়। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের মধ্যে বিরাট সমতল ভূমি, তার মধ্যে হ্রদ নদী ফল ফুল—প্রকৃতির শ্যামলিমার অফুরন্ত শোভা, অদূরে তুষারমৌলী গিরিমালার শীতল শুভ্রতা; পাহাড়ের কোলে কোলে স্বতঃ-উৎসারিত নির্ঝরিণী, আর তারই কুলে কুলে মানুষের তৈরী বিভিন্ন বাগানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব বিন্যাস। মানুষগুলিও সুন্দর ও সুশ্রী। শারীরিক গঠনে ও বর্ণে এদের আছে আর্য্যসুলভ তীক্ষ্ণতা ও শুভ্রতা। এদের সাধারণ ব্যবহারও নম্র ও ভদ্র। শুধু ব্যবসাদার সম্প্রদায় বহুদিনের অসাধুতার ফলে বিদেশীর কাছে কিছু অপবাদ কুড়িয়েছে। "হাউসবোট" ওয়ালা, ফেরীওয়ালা, দোকানদার এরা ন্যাহ্য দামের তিন চার গুণ দাম বলে, নকল জিনিষকে আসল বলে চালায় একথা অস্বীকার করা যায় না। তবু তাদের বিনয় সৌজন্য এমনই যে

তাদের সব ধূর্ত্ততা জেনেও তাদের কাছে জিনিষ না কিনে উপায় থাকে না।

একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে কাশ্মীরের শতকরা ৯০ জন মুসলমান এবং এই ধারণার ওপর ভিত্তি কোরে অনেকে এখানের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কাশ্মীরে মুসলমানের সংখ্যা ১৯৪১ সালের গণনানুসারে শতকরা ৭৭'১১ জন। কাশ্মীর তিনটি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত। জম্মু, কাঠুয়া, উধমপুর, রিয়াসি, মীরপুর, পুঞ্চ ও চেনালী জেলা নিয়ে জম্মু প্রদেশ ; অনন্তনাগ, বারামুল্লা, মজফ্ফরাবাদ জেলা ও শ্রীনগরের সমগ্র উপত্যকা নিয়ে কাশ্মীর প্রদেশ ; লাদাক, স্কার্দ্দু, কারাগিল, জানস্কার এবং গিলগিট অঞ্চল নিয়ে সীমান্ত এলাকা।

কাশ্মীরে ২টি নগর, ৩৯ সহর এবং ৮৯০৩টি গ্রাম আছে। সহরবাসীর সংখ্যা—৩৬২৩১৭ জন এবং গ্রাম্য লোকের সংখ্যা —৩৫০৩৯২৯ জন। ১৯৪১ সালের হিসাব মত ধর্মানুসারে রাজ্যের লোকসংখ্যা—মুসলমান—৩১,০১,২৪৭ হিন্দু—৮.০৯,১৬৫ বৌদ্ধ—৪০৬৯৬, শিখ—৬৫৯০৩, অন্যান্য—৪৬০৫।

সমগ্র কাশ্মীরে ১৩টি ভাষা প্রচলিত, তার মধ্যে প্রধান—ডোগরী, কাশ্মীরী, পাহাড়ী, লাদাকী এবং দারদী। ডোগরা রাজপুতদের ভাষা ডোগরী। এদের অধিকাংশ আবার পাঞ্জাবী ভাষাও ব্যবহার করে। পীরপঞ্জল পাহাড়ের ওপরে কাশ্মীর উপত্যকাবাসীদের প্রধান ভাষা কাশ্মীরী। পুঞ্চ, মীরপুর,

মজফ্ফরাবাদ ইত্যাদি পার্বত্য এলাকার ভাষা পাহাড়ী। লাদাক প্রদেশের ভাষা লাদাকী, যা' পশ্চিম তিব্বতীয়দের অনুরূপ।

কাঠুয়া, জম্মু, উধমপুর এবং রিয়াসী ও মীরপুর জেলার পূর্বাংশে ডোগরাদের প্রধান বাসভূমি। এখানের মোট ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৯ লক্ষ হিন্দু। এই অংশটি ভারতের সীমানায় একেবারে সংলগ্ন।

পাঞ্জাব ও ডোগরাদের ভূমি ডুগারের উত্তর সংলগ্ন হোল লাদাক। এর মোট লোকসংখ্যা ৪০ হাজারের মধ্যে ৩৬ হাজার বৌদ্ধ।

এই থেকে বোঝা যাবে কেন জম্মুর প্রজাপরিষদ কাশ্মীরের ভারতের সংগে বিনাসর্ত্তে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবী কোরেছে, অন্যথায় কাশ্মীর প্রদেশ বাদ দিয়ে শুধু জম্মু ও লাদাককে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আন্দোলন চালিয়েছিল।

বাল্টিস্থান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজফ্ফরাবাদ এবং কাশ্মীরের উপত্যকা ভূমির অধিকাংশই মুসলমান। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা বাদে বাকী সব অংশই এখন পাকিস্থানের কবলে। কাশ্মীর উপত্যকার মোট জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ—এর মধ্যে ১ লক্ষ হিন্দু।

কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত রাখার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তার বিশেষ ভৌগলিক পরিস্থিতি। কাশ্মীরের বিভিন্ন দিকে এসে মিশেছে ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, রাশিয়া, চীন এবং তিব্বতের সীমানা। এর মধ্যে উত্তরের

সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান রাস্তা হল গিলগিট। ভারতের উত্তর সীমান্তকে নিরাপদ রাখতে হোলে গিলগিট ভারতের হাতে থাকা প্রয়োজন।

পূর্বে ভারত থেকে কাশ্মীর যাবার তিনটি রাস্তা ছিল। একটি রাওয়ালপিণ্ডি মারি হয়ে বারমুল্লা দিয়ে, দ্বিতীয়টি শিয়ালকোট হয়ে জম্মু দিয়ে, তৃতীয়টি হাবালিয়ান হয়ে এবটাবাদ দিয়ে—এর সব কটাই এখন পাকিস্থানের কবলে। তাই পাকিস্থান যখন কাশ্মীরকে তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে প্রথম অস্ত্ররূপে এই পথগুলি অবরোধ কোরে বাইরের জগতের সঙ্গে কাশ্মীরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোরে দিলে, তার জনসাধারণের জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ নুন, গম, কাপড়, কেরোসিন, পেট্রোল সব বন্ধ কোরে দিলে, তখন তাড়াতাড়ি ভারতের সীমান্তবর্তী পাঞ্জাবের পাঠানকোট সহর থেকে ৬৭ মাইল ব্যাপী এক নূতন পথ তৈরী কোরে ভারতকে জম্মুর সঙ্গে যোগ করা হয়। এই পথ ছোটখাট পাহাড় ও পার্বত্য নদীর ওপর দিয়ে বিপুল ব্যয়ে তৈরী করা হয়। এই পথ দিয়েই আমাদের যেতে হয়েছিল।

পাঠানকোট থেকে দিনের সর্বক্ষণই বহু বাস ও ট্রাক জম্মু পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। তবে এদের মধ্যে বাইরের যাত্রীদের পক্ষে ডাকবাহী বাস এবং কাশ্মীর সরকারের তত্ত্বাবধানে চালিত কাশ্মীর টুরিষ্ট সার্ভিসের বাসই ভাল, কারণ এরা সময়মত ছাড়ে ও পৌঁছায়।

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ভাড়া জনপিছু ২০৲ টাকা এবং ৪২ পাউণ্ডের অতিরিক্ত মালের ভাড়া মণ পিছু ৭৵০ (১৯৫২ সালের অক্টোবরে।) মরশুমের সময় টুরিষ্ট বাসে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়, তাই কোলকাতা, দিল্লী প্রভৃতির কাশ্মীর সরকারের ব্যবসাকেন্দ্র (Emporium) গুলির মারফৎ বা ভিজিটার্স ব্যুরোতে টাকা জমা দিয়ে পূর্বে রিজার্ভ কোরে রাখা ভাল। যাঁরা স্টেশান-ওয়াগনে (৬ জন যাত্রী-বাহী) যেতে চান তাঁরাও ২০০৲ টাকা দক্ষিণা দিয়ে তার ব্যবস্থা কোরতে পারেন।

এখন কাশ্মীরে যেতে হোলে প্রত্যেককে নিজ প্রদেশের সরকারের কাছ থেকে পারমিট বা ছাড়পত্র নিতে হয়। যাত্রার দিন পনের পূর্ব্বে ছাড়পত্রের দরখাস্ত হোম ডিপার্টমেণ্টে করা উচিত। এই ছাড়পত্র পাঠানকোট থেকে ইরাবতী বা রবিনদী পেরিয়ে ১০ মাইল পর ভারত সীমান্তে মাধোপুরে একবার পরীক্ষা করা হয়। আবার তা ২ মাইল পরে কাশ্মীর সীমান্তে লখিনপুরে (লক্ষণপুর ?) পরীক্ষিত হয়। এখানে মালপত্রও পরীক্ষা করা হয়; উদ্দেশ্য কাশ্মীরে ব্যবসার জন্য নীত মালপত্রের ওপর শুল্ক নেওয়া। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষের কোনও শুল্ক লাগে না। এখানেই যাত্রীরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে নেন। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়ে প্রায় বেলা ১০টায়, কিন্তু পরীক্ষার ঝামেলা সেরে এই ১২ মাইল আসে ১২টায়। এখান থেকে ছোটবড় কয়েকটি পার্বত্য নদী ও প্রায় জনহীন প্রান্তর পেরিয়ে বাস মোট ৬৭ মাইল পথ এসে

তাওয়াই নদীর অপর তীরে জম্মু পৌঁছায় প্রায় ৩টায়। পথের নদীর সেতুগুলিতে সামরিক পাহারা আছে। ঊষর প্রান্তরে মাঝে মাঝে সৈন্যদের ছাউনী। সামরিক বিভাগের গাড়ীগুলি একক বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রায়ই যাওয়া আসা করছে। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ২৬৭ মাইলের সর্বত্রই সামরিক সজাগতার পরিচয় পাওয়া যায়। জম্মুতে বাস বদল কোরে অন্য বাসে উঠে পাহাড় চড়াই স্বুরু হয়। পূর্ব্বে জম্মু পর্যন্ত রেলপথ ছিল এখন তা' পাকিস্থানের কবলে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্থান এই লাইন অবরোধ কোরে কাশ্মীরের ব্যবসা বাণিজ্য ও বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র নষ্ট করে দেয়।

কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী জম্মু। তাওয়াই নদীর তীরে পাহাড়ের কোলে এই প্রাচীন সহর। এর উচ্চতা ১০০০ ফিট, এখান থেকেই হিমালয়ের বেড়াজালে পাহাড়ী রাস্তা মাথা গলিয়েছে। জম্মু সহরের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রের সেনাপতি জাম্বুবান এর কাছাকাছি কোন গুহায় বাস কোরতেন। এই সহর প্রথম তিনিই নির্ম্মাণ করেন, তারই নামে সহরের নামকরণ হোয়েছে "জম্মু"। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশের সঙ্গেও জম্মুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

বর্ত্তমান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা গুলাব সিং ছিলেন জম্মুর অধিবাসী, জাতিতে ডোগরা রাজপুত। ১৮০০ শতকে জম্মুতে ডোগরা রাজপুতেরা কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন; পূর্ব্বে ইরাবতী (রবি)

এবং পশ্চিমে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদী পর্য্যন্ত ছিল তার বিস্তৃতি। এদের মধ্যে স্বনামখ্যাত রাজা ছিলেন রণজিৎ দেও। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজ্য উদীয়মান শিখ সাম্রাজ্যের আওতায় আসে। গুলাব সিং এই বংশেরই বংশধর। ১৮১২ সালে তিনি লাহোরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজ শক্তি ও বুদ্ধির জন্য মহারাজার প্রিয়পাত্র হন। মহারাজা রণজিৎ সিংহ মহম্মদ আজিম খাঁকে পরাস্ত কোরে কাশ্মীর জয় করেন ১৮১৯ সালে। কাশ্মীরের দীর্ঘদিনের মুসলমান রাজশাসনের সেই সময় অবসান হয়। একবার বাজৌরীর রাজা বিদ্রোহ করলে মহারাজা রণজিৎ সিংহ তা' দমন কোরতে পাঠান। গুলাব সিং সে অভিযানে সাফল্য লাভ করায় ১৮২০ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ পুরস্কার স্বরূপ গুলাব সিংহকে জম্মুর রাজা কোরে দেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হোলে তাঁর দূর্ব্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে পোড়ল রাজ্যের গুরুভার। এদিকে ইংরেজ তখন ধীরে ধীরে ভারতের অনেকখানি অধিকার কোরে পাঞ্জাব কেশরীর ভয়ে পাঞ্জাবে সুবিধা কোরতে পারছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে (নভেম্বর) তারা পাঞ্জাব আক্রমণ করলো। ইতিমধ্যে গুলাব সিং তার বাহুবলে জম্মুর সীমানা বাড়িয়ে বাল্টীস্থান, পশ্চিম তিব্বত, লাদাক দখল কোরে জম্মু রাজ্যের অঙ্গীভূত কোরেছেন। লাহোরের শিখ দরবার তাঁর শৌর্য্যবীর্য্য

ও বুদ্ধিবলের সাহায্য পাবার জন্য তাঁকে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রীত্বে বরণ কোরলে। তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত সুযোগ ও সুবিধা লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা কোরলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পরিচালনা কোরলেন না। সেব্রাওয়ের যুদ্ধের ফলে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে শিখদের পরাজয় ঘটলো এবং ইংরাজেরা লাহোর দখল কোরলো। এইভাবে ভারতে স্বাধীন শিখরাজের অবসান ঘটলো। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে "অমৃতসহরের চুক্তির" দ্বারা গুলাবসিং কাশ্মীর উপত্যকা এবং ১৮৪২ সালে শিখদের বিজিত গিলগিট ইংরেজদের কাছ থেকে ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা নজর দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ পান এবং নিজের জম্মুরাজ্যের সঙ্গে তা' যুক্ত করে নেন। এই জন্যই আজও এই রাজ্যের নাম কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য, কারণ দুটি পৃথক রাজ্য একত্রীভূত করা হয়েছিল। গুলাব সিংহ এগার বৎসর রাজত্ব করেন। এর মধ্যে তাঁকে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ কোরতে হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গিলগিট এবং সিন্ধুর অপর তীরের ভূমি শত্রুর হাতে তাঁকে হারাতে হয়। ১৮৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র জীবিত পুত্র রণবীর সিং মহারাজা হন। তিনি পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেন। তিনি কিন্তু পিতার মত রণপিপাসু ছিলেন না। মহারাজা রণবীর সিং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সংস্কৃত এবং পারসীক পুরাতন গ্রন্থের একটি বিরাট গ্রন্থাগার

স্থাপন করেন এবং কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তিনিই প্রথম বিতস্তা নদীর তীরের রাস্তাটী (বারমুল্লা হোয়ে) নির্মাণ করেন—আজ যা' পাকিস্তানের কবলে।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর মহারাজা রণবীর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। মহারাজা প্রতাপসিংহের বহু কীর্ত্তিকলাপ আজও কাশ্মীরের বহু স্থানে তাঁর প্রজা-প্রীতির পরিচয় দেয়।

জম্মু সহরের বিরাট রঘুবীরের মন্দির গুলাব সিং, রণবীর সিং ও প্রতাপসিংহের ধর্ম্মপরায়ণতার সাক্ষ্যস্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে। এত বড় মন্দির এবং প্রাঙ্গন উত্তর ভারতে সচরাচর চোখে পড়ে না। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিধারের ঘরগুলি পান্থশালা এবং এর একাংশে মস্ত চতুষ্পাঠী; এই চতুষ্পাঠীতে আজও বহু ছাত্র বিনা বেতনে বিদ্যালাভ করে। বিনা পয়সায় তারা আহার্য্যও পায়। অসংখ্য নারায়ণ শিলা (পাণ্ডাদের কথামত ১১ লক্ষ) মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া বহু মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রাঙ্গণস্থ নানা মন্দিরে আজও পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরে প্রবেশ করেই ডাইনের দুটি মন্দিরে গুলাব সিংহ ও রণবীর সিংহের নামে প্রতিষ্ঠিত দুটি সুন্দর চূণী ও স্ফটিক পাথরের বাণলিঙ্গ শিব আছেন। এতবড় স্ফটিক কদাচ চোখে পড়ে। বামের একটি মন্দিরে অন্য পাথরের বিরাট বাণলিঙ্গ শিব আছেন মহারাজা অমর সিংহের নামে। অমর সিংহ প্রতাপ সিংহের

কনিষ্ঠ পুত্র; বর্ত্তমানে গদীচ্যুত মহারাজা হরি সিংহের পিতা।

কাশ্মীরের আবদুল্লা সরকার প্রায় ১৫ বিঘার ওপর সব জমি একজনের অধিকার থেকে আইন কোরে কেড়ে নিয়েছেন। তাই এই সব দেব সম্পত্তি কি করে চলে জিজ্ঞেস কোরলাম। যা জানতে পারলাম তা'তে বোঝা গেল—জমি কেড়ে নিয়েও বাকী যা জমি বা আয়কর সম্পত্তি আছে তার আয় সরকারী ধর্ম্মার্থ দপ্তরে জমা হয়, কিন্তু ইদানীং মন্দির খরচের জন্য সেখান থেকে লেখালেখি করেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। মন্দিরের সেবায়েৎ মহারাজ নন। পৃথক একটি পঞ্চায়েৎ আছে। তাঁদের অনুরোধ মত এখনও প্রয়োজনীয় টাকা মহারাজ হরি সিংহ দিচ্ছেন, কিন্তু সে তহবিল শেষ হলে প্রভূত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে হয়তো এতবড় দেবসেবা ও জনসেবার প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কাই যেন এখানে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল দেখলাম।

জম্মু সহরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু মন্দির চোখে পড়ে। এখান থেকে ৩০ মাইল দূরে এ অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থ বৈষ্ণু দেবী (সম্ভবত বৈষ্ণবী থেকে স্থানীয় উচ্চারণে "বৈষ্ণু" দাঁড়িয়েছে)। শীতের সময় শত শত তীর্থযাত্রী পাঞ্জাব ও আরও অনেক দূর থেকে এখানে আসে; এখান থেকে বাসে করে গিয়ে বাকী ৭।৮ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এই বিখ্যাত শক্তি মন্দিরে পূজা দিতে যায়।

জম্মু বেশ বড় সহর, এখানে সরকারী ডাকবাংলায় আহার ও বাসের ব্যবস্থা আছে। মাথাপিছু ঘরের ভাড়া আলো সমেত ২।০ ; (পাখা ঘরপিছু ১৲) খাওয়ার খরচ পৃথক। ডাকবাংলোটী সুসজ্জিত, সুরক্ষিত, সুপরিচালিত। এখানে অনেক ছোট, মাঝারি ও বড় হোটেলও আছে। কাশ্মীর সরকারের একটী দোকান ও ভ্রমণকারী সংস্থা এখানেও আছে (Visitors' Bureau)।

মহারাজার শীতকালীন প্রাসাদ ছিল জম্মু সংলগ্ন রামনগরে। প্রাসাদ এবং তার সংলগ্ন কর্ম্মচারীদের বাসগৃহগুলি যেন মৌনমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে পূর্ব্বের প্রাণ চাঞ্চল্য নেই, কারণ আজ আর সেগুলি মহারাজার বাসভূমি নয়। বলে রাখা ভালো আবদুল্লা সরকারের আমলেও জম্মু শীতকালীন রাজধানী আছে এবং শীতের সময় সরকারী দপ্তর শ্রীনগর থেকে এখানে চলে আসে ও ১লা মে আবার শ্রীনগর যায়। কাশ্মীর রাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রধান সহরে এখন অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠেছে—উলেন্-মিল, কাশ্মীর পটারী, কাশ্মীর শিল্ক ফ্যাক্টরী, ফ্রুট ক্যানিং ফ্যাক্টরী, ঔষধ গবেষণাগার ইত্যাদি। পাকিস্থান সৃষ্টির ফলে এখন বহু বাস্তুত্যাগী শিখ ও পাঞ্জাবী হিন্দু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং ছোটবড় অনেক ব্যবসায়ে তারা আত্মনিয়োগ করেছে।

জম্মুতে মটর বাস বদল ক'রে টুরিষ্ট কোম্পানীর আর একটি বাসে আমরা ঘণ্টাখানেক পরে আবার যাত্রা ক'রলাম।

পাহাড়ী পথে

(পৃ: ১৪)

'কুড'　(পৃঃ ১৩)

সন্ধ্যা সাতটার পর জম্মু থেকে এ পথে গাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ। চল্লিশ মাইল পরে উধমপুর নামে একটী বড় গ্রাম পড়ল। উধমপুর এ অঞ্চলের সদর দপ্তর। মোটর যাত্রীরা জম্মুর পর এখানে পেট্রল পুরে নিতে পারেন। এই উধমপুর এবং জম্মুতে আজ প্রজাপরিষদ দলের ভারতভুক্তির আন্দোলন বেশ প্রবল হোয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা, রাজ্যপালের পৃথক নামকরণ (সর্দার-ঈ-রিয়াসৎ) এবং ভবিষ্যতে ভোট দ্বারা পাকিস্থানে যোগদানের স্বাধীনতার বিরোধী এই দল। এরা চায় কাশ্মীর যে ভারতের অবিভাজ্য অংশ তার স্বীকৃতি। মহারাজা গুলাব সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উধমসিং এই উধমপুরের প্রতিষ্ঠাতা।

আরও ২১ মাইল গিয়ে সন্ধ্যায় "কুড" পৌছলাম ; এখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। যদিও এর উচ্চতা ৫৭০০ ফিট তবু প্রচণ্ড শীত ছিল ; গরম কাপড় জামা, মায় মোটা ওভার কোট গায়ে চাপিয়েও সন্ধ্যায় শীতে কাঁপতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য দুপুরে জম্মুতে গরমের জন্য ডাকবাংলায় পাখা চালিয়েছিলাম। কুডে ভাল ডাকবাংলা, কয়েকটি রেষ্টুরেণ্ট ও দোকানপাট আছে এবং স্থানীয় অনেকে ঘর ভাড়া দেয়। ভাড়া মাথা পিছু ঘর হিসাবে রাত্রিবাসের জন্য চার আনা থেকে দু' টাকা। এখন আমরা হিমালয়ের ভেতর অনেকখানি ঢুকে পড়েছি, কাজেই চারিদিকে চমৎকার পাহাড়ী দৃশ্য। নীল আকাশের কোল পর্য্যন্ত শ্যামল শোভার একটা

অস্পষ্ট অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। কাছের পাহাড়গুলি স্পষ্ট, তাদের বুকে কোথাও কোথাও বুভুক্ষু মানুষ আহার্য্যের সন্ধানে মাটী খুঁড়ে ক্ষেত করেছে, ধাপে ধাপে ক্ষেতগুলি পাহাড়ের বুক থেকে পা পর্য্যন্ত নেমে গেছে ; দূরের পাহাড়গুলি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হোয়ে আকাশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। রাস্তাটী এঁকেবেঁকে এই পর্ব্বততরঙ্গে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। বাড়ীগুলি পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠেছে—রাস্তার ধারের প্রথম সারির ঘরগুলির দোতলার ছাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ীগুলির উঠান—যেমন সব পাহাড়ী সহরেই চোখে পড়ে। পূর্ণিমার রাত্রিতে পাহাড়ের ওপর থেকে সে দিন সে দৃশ্য আরো মনোরম দেখাচ্ছিল। গ্রীষ্মে এ সমস্ত জায়গায় মশা, ছারপোকা ও পিশুর যথেষ্ট উৎপাত থাকে, কিন্তু শীতে তাদের উৎপাত কম।

প্রত্যূষে আবার যাত্রা শুরু হোল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ পাহাড়ের বুকে মাথায় পা দিয়ে ক্রমাগত উঠেছে। প্রায়ই সামরিকবাহিনীর বিভিন্ন ধরণের মোটর ট্রাকের সঙ্গে দেখা হোতে লাগলো। মাঝে মাঝে বাঁক ফিরেই বা বাঁকের মাথায় হঠাৎ সে রকম চোখোচোখিতে প্রাণ চমকে উঠছিল। এটা অহেতুক নয় ; রাস্তার ধারে ধাক্কা খাওয়া স্থবির ও জখম গাড়ী কয়েক জায়গাতেই চোখে পড়েছিল। তা'ছাড়া লোকমুখে শোনা গিয়েছিল এ রকম সাংঘাতিক সংঘর্ষ এ'পথের স্বাভাবিক ঘটনা।

পথের ধারের কোন পাহাড় পাথর আর মাটির, কোনটা শুধু পাথরের, কোথাও পাইনের বন, আবার কোন পাহাড়ে শ্যামলতার লেশমাত্র নেই।

৭০০০ ফিট চড়াই করে ১২ মাইল এসে বাটোটে গাড়ী থামলো একটু বিশ্রাম করবার জন্যে। এখানে ভালো ডাক-বাংলো, ধর্ম্মশালা ও বাজার আছে, একটী যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে; গণ্ডগ্রামটীর উচ্চতা ৫১১৬ ফিট, কুডের মত মোটর যাত্রীদের এটীও একটী রাত্রিবাসের আড্ডা। উধমপুরের পর মোটরযাত্রীরা এখানেই পেট্রল পাবেন।

এরপর আমরা ক্রমশঃই নীচে নামতে লাগলাম। অবশ্য পাহাড়ী রাস্তায় কোথাও সোজা নীচে বা ওপরে ওঠা যায় না, চড়াই উৎরাই করেই চলতে হয়। আরও ১৭ মাইল গিয়ে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদী পেরিয়ে রামবানে (২৪০০ ফিট) কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী থামলো। পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক যাত্রীই বমি করতে আরম্ভ করেছিলেন, আর অনেকেই মাথা টিপে চোখ বুজে বসেছিলেন। গাড়ী থামতে তাঁরা মাটীর বুকে নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পাহাড়ের কোলে কোলে সমতলক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ছাউনি মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছিল; এখানের ছাউনীটী বেশ বড়; সামরিক কারণে এ অঞ্চলের ছবি নেওয়া নিষিদ্ধ।

রামবান থেকে রামলু (১৪ মাইল, ৪১০০ ফিট) হোয়ে বানিহালে (১০ মাইল) মধ্যাহ্নে গাড়ী থামলো। এখানে

সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলেন। পীরপঞ্জল পাহাড়ের কোলে বানিহাল গ্রাম, এর উচ্চতা ৫৭০০ ফিট। এখানে ডাক-বাংলো, রেষ্টহাউস, ডাকখানা ও শুল্কদপ্তর আছে। সমস্ত মালপত্র পরীক্ষা করা হয় ও প্রত্যেক গাড়ী পিছু মাশুল আদায় করা হয়। এখানে ভাল হোটেল চোখে পড়লো না। সাধারণ বাজার মিষ্টির দোকান ও ছোটখাটো হোটেল আছে।

এখানের মাছের স্বাদের সুনাম আছে। কতকটা সেজন্য এবং কতকটা কোলকাতা ছেড়ে মাছের মুখ না দেখায় একটা হোটেলে ভাত আর মাছের বরাত দিয়ে কাঠের টেবিলের ধারে বেঞ্চে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা কোরতে লাগলাম। পাশেই মাছির ঝাঁকের মধ্যে বসে কেউ কুক্কুট মাংস, কেউ বা ভেড়ার মাংস খাচ্ছিলেন। হোটেলওয়ালারা অধিকাংশই পাঞ্জাবী, মিষ্টির দোকানীও ওরাই। ছোট কই মাছের মত দেখতে ভাজা মাছ আর ভাত দিয়ে গেল। সজল জিভে মাছের টুকরো মুখে দিতেই গা গুলিয়ে উঠলো। এত বিস্বাদ মাছ রাশিয়াতেও খাই নাই। (পরে শুনেছি রাশিয়ায় ভাল মাছ পাওয়া যাচ্ছে ; ১৯৩৩ সালে তা ছিল বিলাস দ্রব্যের সামিল, তাই দুর্ম্মূল্য দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ)। আহারে আশাভঙ্গ হোল, অগত্যা কইএর বদলে শুধু দই দিয়ে আহার পর্ব শেষ হোল।

এখানে আশে পাশের পাহাড়গুলির মধ্যের দূরত্ব যেন কিছু বেশী কারণ তাদের গায়ের ধানের ক্ষেতগুলি ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে নেমে গেছে—খাড়া ঢালু নয়। এখানের ভেড়া কুকুর

ছাগল প্রভৃতির লোমগুলি বেশ লম্বা ; শীতের জন্য প্রকৃতিদেবী তাদের এই স্বাভাবিক সজ্জায় সাজিয়েছেন। দুপুর বেলাতেও বেশ শীত ছিল। এখান থেকে একটা হাঁটাপথ পাহাড় পেরিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার মোগল যুগের অন্যতম বিখ্যাত বাগান ভেরীনাগ গেছে। বানিহালে পেট্রল পাম্প আছে। এর পর শ্রীনগর ছাড়া পথে আর কোথাও পেট্রল পাওয়া যায় না ! খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চড়াই শুরু হোলো।

প্রায় ২০ মাইল পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে উঠে পীরপঞ্জল পাহাড়ের মাথায় এসে গাড়ী থামলো। এদিকের পাহাড় অধিকাংশই শুধু পাথরের, তাই বনানীর শ্যামলতাশূন্য।

পীরপঞ্জলের এই শৃঙ্গটিকে আর বেড়ে যাবার উপায় নাই, মাথা উঁচু ক'রে সে পথরোধ কোরে দাঁড়িয়ে আছে ; তাই মানুষ এর বুক ফুঁড়ে সৃষ্টি কোরেছে সুড়ঙ্গ। এই টানেল বা সুরঙ্গটি ৬৫০ ফিট লম্বা এবং ১৫ ফিট চওড়া। এখানের উচ্চতা ৮৯৮৫ ফিট। সুড়ঙ্গটীর মধ্যে একখানি মাত্র গাড়ী যেতে পারে, এজন্য পূর্ব্বে বানিহাল থেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাইরের গাড়ীগুলিকে ছাড়া হত, যা'তে কাশ্মীর থেকে আগত কোনো গাড়ীর সঙ্গে সুড়ঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হয়। এখন কিন্তু সামরিক বাহিনীর যাতায়াতের জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলাম। অবশ্য সামরিক বাহিনীর কোন বড় রকমের যানশ্রেণী (convoy) কোন দিক থেকে গেলে অপর দিকের গাড়ী বন্ধ রাখা হয়—দু'একখানা গাড়ী এলে তা'কে সুড়ঙ্গের মুখে আটক রেখে সুড়ঙ্গের ভেতর

একদিকের গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন সুড়ঙ্গের উভয় মুখেই সামরিক শান্ত্রী রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সুড়ঙ্গপথ তুষারপাতের জন্য বন্ধ থাকে, তখন আকাশ-পথ ছাড়া কাশ্মীরের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের আর পথ থাকে না। বরফ গলার প্রথম মুখে এ রাস্তা বেশ বিপজ্জনক; কারণ বরফ গলা জলে চারিদিকের পাহাড় নরম থাকে, তার ফলে পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে রাস্তা হঠাৎ বন্ধ কোরে দেয়, ঘাড়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। রাস্তার ধারে ধারে এরকম বড় ধ্বস পড়ার চিহ্ন অনেক জায়গাতেই চোখে পড়লো। আমরা অক্টোবর মাসে (১৯৫২) গিয়েছিলাম, কাজেই রাস্তা ছিল পরিষ্কার, কিন্তু পথের ধারে অধিকাংশ নির্ঝরণী ছিল জলহীন, তা'দের বিরস বুকের ছোটবড় পাথরগুলিই জানিয়ে দিচ্ছিল তাদের অস্তিত্ব। বর্ষায় কিন্তু এদের প্রবল প্রতাপ! এদের প্রচণ্ড স্রোতে তখন পাহাড় ভাঙে, পাথর বালি হয়ে যায়—পথ হয় বন্ধ।

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরও কিছুদূর ক্রমাগত উৎরাই কোরে পাহাড়ের বাঁকের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়তে লাগলো কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামল শোভা—সবুজ সমতলের বুকে আঁকাবাঁকা ধানের ক্ষেতের সীমারেখা, আর তা'দের মাঝে মাঝে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘশীর্ষ শুভ্রদেহ সরল পপলার গাছের শ্রেণী। যাঁরা এতক্ষণ মাথাটিপে চোখ বুজে বসেছিলেন, কেউ কেউ বা আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়েছিলেন বমির কেলেঙ্কারী থেকে বাঁচবার জন্য—তাঁরা এবার ধীরে ধীরে মাথার

ঢাকা সরালেন ; চোখ মেলে নীচে তাকালেন উৎকণ্ঠিতভাবে—জিজ্ঞাসা কোরলেন "আর কত দুর ?"

প্রায় ৯ মাইল পথ এসে সমতলের বুকে পেলাম একটি ছোট গ্রাম "মুণ্ডা" (আপার মুণ্ডা, ৭২২৭ ফিট), এর কিছু পর নীচু মুণ্ডা। এখান থেকে ভিন্ন পথে ৫ মাইল দূরে "ভেরীনাগ।"

ভেরীনাগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণা থেকেই কাশ্মীরের সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের মূল ধমণী ঝেলাম বা বিতস্তা নদীর উৎপত্তি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হ'য়ে ১৬শ খৃঃ অব্দে এখানে বাগান তৈরী করেন ও একটী আটকোণা ইমারৎ দিয়ে এই জলধারাকে কুণ্ডে আবদ্ধ ক'রে তার চারধারে স্নানাগারের ব্যবস্থা করেন। কুণ্ডের কাছাকাছি ছিল তাঁর প্রমোদভবন। এর ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। সেখানে মাটীর নলের মধ্যে দিয়ে জল নিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, আজও তা দেখা যায়। 'বাগ' বা উদ্যানটী আজও বিদ্যমান। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর নাকি বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন এই সুরম্য স্থানটীতে সমাহিত করা হয়, কিন্তু সম্রাটের এই ইচ্ছা পূরণ হয় নাই ; যদিও কাশ্মীর থেকে লাহোর ফেরার পথে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভেরীনাগের এই কুণ্ডটী আজ হৃতশ্রী, তবুও তার স্ফটিক স্বচ্ছ জলে আজও অসংখ্য মাছের নির্ভয় বিচরণ দর্শককে আনন্দ

দেয়। তীর্থ হিসাবেও ভেরীনাগ হিন্দুদের কাছে পবিত্র। ভারতে গঙ্গার মত কাশ্মীরে বিতস্তা নদী পবিত্র বলে পরিগণিত; তার উৎপত্তিস্থল হিসাবে এটী তীর্থস্থান। প্রবাদ, দেবী বিতস্তা যখন নদীরূপ পরিগ্রহ করে এখান থেকে মর্ত্তে প্রকাশ হবার জন্যে এলেন, তখন দেখলেন স্বয়ং মহাদেব এখানে বোসে, অতএব তাঁকে ফিরে গিয়ে এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় মাইলখানেক দূরে বিতভূত্র (Vithavutra) নামে একটী ঝরণা থেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়; অবশ্য তার জলও ক্রমে ক্রমে ভেরীনাগের কুণ্ডনিঃসৃত জলের সঙ্গে মিশছে, এই থেকেই এ জায়গার নামকরণ হোয়েছে—ভেরীনাগ। সংস্কৃতে 'ভির' শব্দের অর্থ নাকি ফিরে যাওয়া এবং নাগ শব্দের অর্থ ঝরণা। ভিরনাগ থেকে ক্রমে দাঁড়িয়েছে ভেরীনাগ।

শ্রীনগর থেকে এর দূরত্বের জন্য (৫৫ মাইল) শুধু এই কুণ্ড ও বাগানটী দেখতে আসা ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। এজন্য সম্ভব হ'লে যাবার পথে "মুণ্ডা" থেকে এটী দেখে যাওয়া ভাল।

কয়েকটা ছোটখাট পাহাড়ের পাশে পাশে ও বুক দিয়ে আরো একটু এগিয়ে ক্রমে বাস এসে পোড়ল একেবারে সমতল ভূমিতে; বড় পাহাড়গুলি গেল দূরে সরে আকাশের কোলে, আশে-পাশে বহু জলপ্রণালী অবিরাম ধারায় চোলেছে। তাই থেকে দু'ধারের সমতল শস্যক্ষেত্রগুলিতে সেচন চলে, মাঠের মাঝে মাঝে সোনালী ধানগুলি কেটে গোল করে

বাঁধা। সন্ত ধান কাটা শেষ হোয়েছে; মাঠে কয়েকদিন শুকিয়ে ঘরে তুলবে কৃষক; কোথাও এখনও মাঠের বুক জুড়েই নুইয়ে পড়ে রয়েছে এই সোনালী সম্পদ। রাস্তার দু'ধারে সমান্তরাল-ভাবে চলেছে শ্যামল ঋজু পপলার গাছের শ্রেণী; সাদা সরল কাণ্ড ঘিরে তার সবুজ পাতা—এ দৃশ্য কাশ্মীরের একেবারে নিজস্ব।

১০ মাইল এসে 'কাজীকুণ্ড' গ্রামে বাস থামলো। কয়েকজন স্থানীয় যাত্রী এখানে নামলেন। তাজা এবং শুকনো ফলের এটী একটী বড় ব্যবসাকেন্দ্র। গ্রামটীর আশ-পাশে আখরোট, আপেলের গাছ এবং কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য চেনার গাছ চোখে পড়লো। আশে-পাশে বিতস্তার বিস্তৃতি ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে।

আরও ১৩ মাইল গিয়ে খানাবল গ্রাম থেকে বিতস্তা বিস্তৃত নদীর আকার নিয়েছে। এখান থেকেই সুরু হোয়েছে তার বুকে নৌকা চলাচল। খানাবল থেকেই দু'টী রাস্তা কাশ্মীর উপত্যকার দু'টী প্রধান দ্রষ্টব্যস্থানের দিকে গিয়েছে—একটী অমরনাথ যাত্রার পথ পহলগামের দিকে—অপরটি কাশ্মীর প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর অনন্তনাগ বা ইস্‌লামা-বাদের দিকে।

এখান থেকে বিজবিহার (৪ মাইল) গ্রাম পেরিয়ে আরো কিছুদূর এসে সঙ্গম সেতু দিয়ে বিতস্তা অতিক্রম করলাম এবং তাকে বাঁয়ে রেখে দক্ষিণতীর ধরে এগিয়ে চল্লাম। খানাবল

থেকে ১৭ মাইল পর অবন্তীপুর। এখানে হিন্দু আমলের কয়েকটা বিখ্যাত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। দু'দিন ধরে বাসের ঝাঁকানী এবং পাহাড়ের ঘুরপাক খেয়ে প্রায় সব যাত্রীই তখন কাহিল হোয়ে পোড়েছেন, তার ওপর বেলা থাকতে থাকতে শ্রীনগর পৌঁছে আস্তানা খুঁজে নেওয়ার তাগিদে এখানে নামার উৎসাহ কারও ছিল না। এ জায়গা আমরা পরে দেখেছি, তা যথাস্থানে বোলব। কাশ্মীরের সমতল উপত্যকাতেও মাঝে মাঝে ভারতীয় সেনানীদের ঘাঁটী চোখে পড়ল। অবন্তীপুর থেকে পামপুরের বিখ্যাত কুমকুম ক্ষেতের মাঝ দিয়ে আরও ১৬ মাইল এসে আমরা শ্রীনগর সহর (৫২১৪ ফিট) পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যাবেলা।

বাসের আড্ডায় হাউসবোট-মালিক ও দালাল এবং হোটেলের লোকেরা যাত্রীদের প্রায় ছেঁকে ধরে। এদের নিজ নিজ হাউস্ বোটের বা নৌকা-গৃহের সজ্জা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনায় বিভ্রান্ত হোতে হয়। অনেকে রাত্রের মত নামকরা সাহেবী হোটেল 'নিডোজ'-এ গেলেন স্রেফ 'সেফটীর' খাতিরে ; কেউ কেউ বা দিশী ম্যাজেষ্টিকে। আমরা হাউস্-বোট দেখতে গেলাম; ৩ জন বোটের মালিক সঙ্গ নিল ; যার বোট পছন্দ হবে তারটাই ভাড়া নেব স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম। টাঙ্গায় মালপত্র চাপিয়ে ও নিজেরা উঠে ডাল গেটের দিকে গেলাম। এই অঞ্চলটিই প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে থাকার প্রশস্ত জায়গা। চীনার বাগ শীতকালে ঠাণ্ডা হবে ; ঝেলাম নদীর বুকের বোটগুলি

শ্রীনগরের পথে পপলার প্রহরী (পৃঃ ২১)

'হাউসবোট বা নৌগৃহ'

(পৃঃ ২৩).

সহরের মধ্যে ; তাই এই অঞ্চলেই আড্ডা নেওয়া স্থির কোরলাম। কাশ্মীরের বোটওয়ালাদের স্বভাবের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় থাকায় তাদের সৌজন্য ও বর্ণনার সত্যতাকে সরলভাবে বিশ্বাস না কোরে মালপত্র গাড়ীতে রেখে শীকারায় চোড়ে ৩।৪টী বোট দেখে একটি বেছে নিলাম।

প্রতি হাউস্‌বোটে বা নৌগৃহে সাধারণতঃ একটি সাজান বৈঠকখানা, একটি খাবার ঘর, ছুটি বা তিনটি শোবার ঘর, ৩।৪টি স্নানের ঘর ও শৌচাগার থাকে। হাউস্‌বোটের মালিক বা মাঝিরা এরই সংলগ্ন ছোট নৌকায় বাস করে। এটীই তাদের পাকাপাকি বাসস্থান। নৌগৃহের ভাড়াটেদের রান্নাবান্না এখানেই হয় বোলে ইংরেজী আমল থেকেই এদের নাম "কিচেন বোট" (Kitchen boat)—এ ছাড়া তীরে যাওয়া আসার জন্য একটি ছোট নৌকা বা শীকারা থাকে। হাউস্‌-বোট ভাড়ার সঙ্গে রাঁধুনী, ২ জন খানসামা এবং মেথরের বেতনও ধরা থাকে। খাবার জল তীরের কল থেকে আনতে হয়, এও বোটের মালিকেরই করণীয়। অবশ্য এসব কাজ মালিকের পরিবারবর্গই সাধারণতঃ করে থাকে। জলের বুকে থাকলেও রান্না ও খাবার জল বাইরে থেকে আনতে হয় ; কারণ বিতস্তা বা ডালের জলে সহরের সব নোঙরা এসে পড়ে।

হাউস্‌বোটগুলি সাধারণতঃ নদী, খাল বা হ্রদের একটী তীরে গাছপালার সংগে বাঁধা থাকে। এই নৌগৃহগুলির

অধিকাংশেরই ছাদে বসবার ব্যবস্থা আছে। ছাদের ওপর কাপড়ের ছাউনী, ধারে পর্দ্দা ও ফুল গাছের টব দিয়ে সাজান। শীতের দুপুরে বা গ্রীষ্মের সকালে বিকেলে এ জায়গাটী বড় আরামের। বর্ত্তমানে প্রত্যেক নৌগৃহের নম্বর ও লাইসেন্স হোয়েছে! নৌকার আয়তন হিসাবে এদের সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্ব্বে এদিকের নৌকায় বিজলীবাতি ছিল না, এখন প্রায় সব নৌকাতেই বিজলী হোয়েছে; কিন্তু শ্রীনগরের বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী মাহুরা পাকিস্থানী "কাবালী"রা ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে নষ্ট কোরে দেওয়ায় এবং আজও তা' সম্পূর্ণ মেরামত না হওয়ায় সহরের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় না। ফলে বৈদ্যুতিক আলোগুলি থাকতেও হাউস্‌বোটে লণ্ঠন জ্বালতে হয়।

রাস্তার আলোগুলির অবস্থাও অনুরূপ। এত কম জ্বলে যে বালবের তার গুলি মাত্র লাল হয়, কিন্তু তার কোন প্রভা থাকে না। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ৩।৪টী জ্বেলেও লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করতে হয়। রাত্রি ১০।১০॥০টার পর যখন অধিকাংশ লোকেই আলো নিভিয়ে দেয়, তখন আলোগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক উজ্জ্বল হয়। প্রথম দিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ঘরের আলো দেখে হঠাৎ ভ্রম হোল বুঝি সকাল হোয়েছে, ঘড়ি দেখে সে ভুল ভাঙ্গলো, কারণ তখন রাত্রি দু'টো।

এই কাঠের ভাসমান গৃহগুলিকে ইচ্ছামত এখানে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়—অবশ্য তা দু'চার জনের কাজ
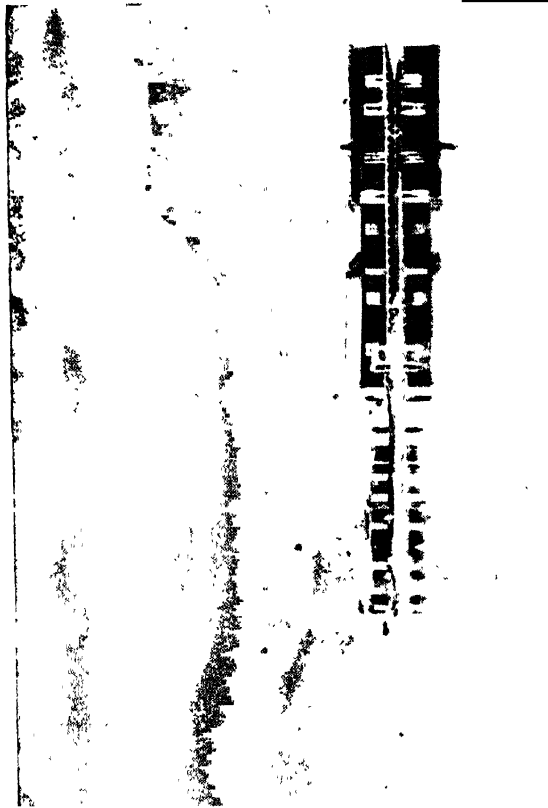
ডালের তীরে নৌগৃহের শ্রেণী

(পৃ: ২৪)

ডালের তীরের একাংশ (পৃঃ ২৫)

উইলো গাছে বাঁধা নৌগৃহের সারি (পৃঃ ২৫)

নয়। ঝেলাম নদী, ডাল হ্রদ, নাগিন বাগ, নাসিম বাগ, বা দূরবর্ত্তী উলার, গন্ধর্ব্বল, মানসবল হ্রদেও কিংবা সাদিপুর বারামুল্লা সহরেও ২০৷২৫ জন কুলীর সাহায্যে এগুলিকে নিয়ে পছন্দমত জায়গায় রাখা যায়—অবশ্য এ জন্য সরকারকে ঐ জায়গার ধার্য্য ভাড়া দিতে হয়। আয়তন ও স্থানমাহাত্ম্য হিসাবে মাসিক ভাড়া ১৫৲ থেকে ৩০৲। এই ভাসমান নৌগৃহগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৭০ থেকে ১৫০ ফিট এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১৫ ফিট। অবশ্য কাশ্মীরীদের নিজেদের বাসের জন্য এর চেয়ে অনেক বড় বা ছোট এবং দেড়তলা, দু'তলা হাউস্‌বোটও চোখে পড়লো। ঝড়ের ভয়ে নৌগৃহগুলিকে বেশী উঁচু করে না, তা' ছাড়া বেশী উঁচু হোলে ঝেলামের ওপরের অনেক সেতুর নীচে দিয়ে পারাপার হবে না। প্রত্যেকটী নৌগৃহের এক একটী নাম আছে—জাহাঙ্গীর, তাজমহল, লোটাস, পপি, ডেজী, ভিক্‌টরি, গ্লোরী, ভাইসরয়, রাণী, জয়হিন্দ, রাজপুতানা, হানিমুন—যা হয় একটা গালভরা বা কাব্যময় নাম।

পূর্ব্বেই বলেছি কাশ্মীর উপত্যকার ১৫ লক্ষ অধিবাসীর মাত্র ১ লক্ষ হিন্দু, বাকী মুসলমান; হিন্দুদের সাধারণ উপাধি পণ্ডিত। যজন, যাজন, লেখাপড়া, চাকরী, এই ছিল হিন্দুদের পেশা। চাষ, নৌকা চালান এবং অন্যান্য কাজকারবার মূলতঃ মুসলমানরাই করে থাকে।

আমার গৃহিণী হাউস্‌বোটের খাওয়া অপেক্ষা স্বপাকে কুকারে রান্না করাই পছন্দ কর'লেন। এতে আর্থিক লাভ

এবং স্বপাকের শুদ্ধতা দু'টোরই সুবিধা পাওয়া যাবে। আহার্য্য বাদ দিলে সাধারণতঃ নৌগৃহের ৮৲।১০৲ দৈনিক ভাড়া, তবে অক্টোবরে শ্রীনগরের ভাঙ্গা হাট। অনেক যাত্রীই তখন চলে গেছেন, বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা যাই যাই করছেন। কাজেই দর কষাকষি করে দৈনিক ৫৲ 'ভাড়ায় আমরা নৌকার মাঝিকে রাজী করিয়েছিলাম। বলে রাখা ভাল, একটু ছোট নৌকা দৈনন্দিন ৩৲।৪৲ ভাড়াতেও পাওয়া যায়, যদিও মালিকেরা প্রথমে বলবেন ১২৲।১৪৲—এবং সেটা শুধু আপনার খাতিরেই। এই সেদিন কোলকাতার মিঃ সরকার কি মিঃ সান্যাল ১৫৲ 'টাকায় থেকে গেছেন। কোলকাতাওয়ালারা খুব লোক ভাল, বাঙালী সাহেবদের সঙ্গেই তার কারবার বেশী এবং যেহেতু আপনি বাঙালী সেই হেতু ১৫৲ স্থলে ১২৲ টাকাতেই আপনাকে দেব। কিন্তু আপনি ৩৲ থেকে সুরু করলে সে এমনভাবে হেসে উঠবে বা এমন একটা ভঙ্গী করবে যে আপনার শ্রীনগর না গিয়ে রাঁচী যাওয়া উচিত ছিল। তারপর যখন আপনি রাজী না হোয়ে শিকারায় চাপছেন, তখন হয়ত বলবে যেহেতু আপনি এতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বোলেছেন ও সে আপনার ভদ্রতায় অত্যন্ত অভিভূত হোয়েছে, সেজন্যে সে ৮৲ টাকায় আপনাকে দেবে। তাতেও রাজী না হোয়ে যখন শিকারায় কোরে তীরে এলেন, তখন হয়ত ৪৲ টাকাতেই রাজী হবে। অবশ্য সবই নির্ভর করে চাহিদার ওপর।

নৌগৃহের সরকার নির্দ্ধারিত দক্ষিণা আয়তন ও গৃহসজ্জা হিসাবে মাসিক ২০০৲ থেকে ৩০০৲ এবং খাওয়া শুদ্ধ দৈনিক মাথাপিছু ১০।১৫৲ টাকা। অবশ্য ২।৩ জন থাকলে সকলের জন্য মোট দৈনিক দক্ষিণা ২০।২৫৲। কিন্তু চাহিদা কম থাকলে এই সরকারী দক্ষিণার অনেক নীচেই ব্যবস্থা হোতে পারে। তবে যে ভাড়াই ঠিক হোক, তা ওদের ছাপানো চুক্তি-পত্রে লিখে একখানা নিজের কাছে রাখা উচিত এবং গরম জল, রেডিও, ইলেকট্রিক, শীকারা ইত্যাদি ভাড়ার মধ্যে ধরা রইলো কিনা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা ভাল, নইলে পরে এইসব নিয়ে অকারণ ঝঞ্ঝাট হয়।

কাশ্মীরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে সুরু করার আগে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির অতীত ইতিহাস কিছু জেনে রাখা ভালো। সেই ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশটীকে ও দ্রষ্টব্যগুলিকে দেখলে দেখার ও বোঝার অনেক সুবিধা হয়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে কাশ্মীরকে জানতে হলে ঐতি-হাসিক কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনী থেকেই কাশ্মীরের রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস সুরু করা উচিত, কিন্তু তার আগেও কাশ্মীরের সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাকাল থেকে প্রচলিত আছে এক পৌরাণিক কাহিনী। চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন শৈলশিখরের মাঝে সন্নিবেশিত এই সুরম্য অধিত্যকায় আগে ছিল এক বিরাট হ্রদ। এখানে শৈলসুতা দেবী পার্ব্বতী নৌকা বিহার কোরতেন। কিন্তু ক্রমে এখানে জলোদ্ভব নামে এক শক্তিশালী নাগের উদ্ভব

হল। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাণীকুল তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠল। সপ্তম মনুর আধিপত্যকালে একদা মহামুনি মারিচীর পুত্র প্রজাপতি কাশ্যপ এখানে এসে তাঁর পুত্র নীলের কাছে জলোদ্ভবের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনে তাকে ধ্বংস করার সংকল্প কোরলেন। কিন্তু জলোদ্ভবও কম পাত্র নয়, সে ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র। অতএব কাশ্যপ তাকে ধ্বংস করার জন্য এক হাজার বৎসর ধরে তপস্যা কোরে শক্তি সঞ্চয় কোরলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হোল, কিন্তু জলোদ্ভব প্রয়োজন মত হ্রদের জলে এমনিই গা ঢাকা দিতে লাগলো যে তাকে বধ করা দুঃসাধ্য হোয়ে উঠল। এই যুদ্ধে ক্রমে বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা কাশ্যপের ওপর প্রসন্ন হোয়ে তাঁকে সাহায্য কোরতে এলেন। অবশেষে বিষ্ণু বারামুল্লার কাছে পাহাড়ের নীচে তাঁর হল দিয়ে এক ছিদ্র কোরে দিলেন। সেখান দিয়ে সমস্ত হ্রদের জল নীচে ভারতবর্ষের দিকে নেমে এল। (বলা বাহুল্য এখান থেকেই বিতস্তা নদী কাশ্মীরের সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ের কোলে কোলে ভারতবর্ষে নেমে এসেছে। অন্যমতে বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধোরে দাঁত দিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে হ্রদের জল বের কোরে দেন, তাই এই জায়গাটীর নাম বরাহ-মূল যা ক্রমে দাঁড়িয়েছে বারমুল্লায়।) এর ফলে হ্রদ শুকিয়ে তলাকার সমতলভূমি বেরিয়ে পোড়ে কাশ্মীর উপত্যকার সৃষ্টি হোল। কিন্তু তবু চতুর জলোদ্ভবকে বধ করা গেল না, কারণ হ্রদের যে যে অংশ গভীরতর ছিল সেখানের জল থেকে গিয়ে যে ছোট হ্রদগুলি সৃষ্টি হোল (ডাল, উলার,

মানস, প্রভৃতি) তারই তলায় সে লুকিয়ে রইল। তখন দেবী পার্ব্বতী একটি সারিকার (ময়না) মূর্ত্তি ধরে চঞ্চুতে ছোট একটা পাথর নিয়ে উড়তে উড়তে জলোদ্ভব যেখানে লুকিয়ে ছিল সেইখানে ফেলে দিলেন। সেই পাথর ক্রমে বড় হোয়ে পাহাড়ের আকার ধরে জলোদ্ভবকে জলেই বধ কোরলে। এই পাথরটাই বর্ত্তমানের হরিপর্ব্বত। (ডাল হ্রদের ওপরেই এই নাতি-উচ্চ পাহাড়টার মাথায় আকবরের প্রতিষ্ঠিত দুর্গ আছে, মুসলমানের মসজিদ আছে, শিখদের গুরুদোয়ারা আছে, আবার হিন্দুর সারিকা দেবীরও মূর্ত্তি আছে।) দেবী পার্ব্বতীর কাশ্মীরে তাই অন্য নাম "সারিকা"। কাশ্যপের সৃষ্ট মীর অর্থাৎ ভূমি—এই থেকেই এখানের আদি নামকরণ কাশ্যপ-মীর যা ক্রমে দাঁড়িয়েছে কাশ্য'মীর বা কাশ্মীর। কারো কারো মতে জাফরাণের জন্মভূমি ব'লে এদেশের নাম কাশ্মীর, কারণ জাফরাণ বা কুঙ্কুমের পুরাণো সংস্কৃত প্রতিশব্দ কাশ্মীরা অথবা কাশ্মীরাজা।

পৌরাণিক কাহিনী ছেড়ে ইতিহাসের সময় দেখা যায় বিভিন্ন হিন্দু রাজা এখানে চার হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেন। কলহন তাঁর ইতিহাস আরম্ভ কোরেছেন খৃঃ পূর্ব্ব ১১৮৪ সাল থেকে, কিন্তু তাতে আরো ১২৬৬ বৎসর পূর্ব্বেকার ৫২ জন রাজার কথা তিনি বোলেছেন। আমাদের এ কাহিনীতে অতীতের সে দীর্ঘ ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন। খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ শতকে মহারাজ অশোক কাশ্মীর জয় করেন এবং তাঁর কালেই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রসার লাভ করে। শ্রীনগর সহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ অশোক

বর্ত্তমান শ্রীনগর সহরের প্রায় ৪ মাইল দূরে পাণ্ড্রেথান (এখানে আজও কয়েকটী পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে)—এখানেই অশোক প্রথম নগর স্থাপনা করেন। বোলে রাখা ভাল—পাণ্ড্রেথানের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষগুলি মহারাজ অশোকের সময়কার নয়, অশোকের অনেক পর রাজা পার্থর (৯০৬—৯২১ খৃঃ অঃ) প্রধান মন্ত্রী মেরুবাহন নির্ম্মিত "মেরুবর্দ্ধন স্বামীর" মন্দিরের এগুলি ভগ্নাবশেষ। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে উৎসর্গীকৃত এই নবনির্ম্মিত নগরের নামকরণ হয় শ্রীনগরী। বৌদ্ধদের পর হিন্দু ও মুসলমান আমলে শ্রীনগরীর বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কেউ একে ভেঙ্গেছে কেউ বা নূতন কোরে গড়েছে। অশোকের পর জালুকা, হুসকো, জুসকো, কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটরা এখানে রাজত্ব করেন। বর্ত্তমানের শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের শিখরের শিব মন্দির সর্বপ্রথম জালুকা তৈরী করান (খৃঃ পূর্ব ২০০) বৌদ্ধস্তূপ হিসাবে। তখন এই পাহাড়ের নাম ছিল "গোপ পর্বত"।

ধীরে ধীরে বৌদ্ধপ্রভাব ম্লান হয়ে এলে, হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ কোরে শৈবমত আবার বিস্তার লাভ করে। বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক হুয়েনসাং যখন (৬৩১—৬৩৩ খৃঃ অব্দে) রাজা দুর্ল্লভ বর্দ্ধণের সময় কাশ্মীরে আসেন তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। এখানে সেখানে যে দু'চারটী বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপ ছিল তা শুধু তাদের ধ্বংসাবশেষ থেকেই চেনা যেত। রাজা দুর্লভ বর্দ্ধণ অবশ্য এই চৈনিক পর্য্যটককে রাজসম্মানে

আপ্যায়িত কোরে জয়েন্দ্র বিহারে বাসের ব্যবস্থা কোরে দেন এবং ২০ জন লেখক দেন এ দেশের বৌদ্ধগ্রন্থের নকল কোরতে। তিনি ২ বছর এখানে থেকে এখানকার পণ্ডিতদের অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন। তাঁর সময় কাশ্মীরে মাত্র ৫০০০ বৌদ্ধ ও ১০০টী বৌদ্ধ মঠ ছিল। ৫২৮ খৃঃ অব্দে নিষ্ঠুরতার জীবন্ত প্রতীক কুখ্যাত হূণ মিহিরকুল কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠণ, হত্যা ও নিষ্ঠুরতার তাণ্ডবে এই সৌন্দর্য্যের লীলাভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেন। গুলমার্গ যেতে দূরে পীরপঞ্জল পাহাড়ের একটা শিখরকে আজও হস্তীভঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়; মিহিরকুল নাকি এখান থেকে একশ' হাতীকে পাহাড়ের নীচে ফেলে দিয়েছিলেন—শুধু তাদের মৃত্যুযন্ত্রণার চীৎকারের এবং বেদনায় আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। এই লোকটি নাকি জীবনে কখনও হাসেন নাই। পরবর্ত্তী রাজা গোপাদিত্য প্রজাবৎসল ও সুশাসক ছিলেন। তিনি আবার ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে আনেন এবং সংস্কৃত ভাষার এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেনা। ইনি রাজত্ব করেন সপ্তম শতাব্দীতে এবং তাঁর রাজধানী বর্ত্তমানের শঙ্করাচারিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ থেকে হরিপর্ব্বত অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; (এ অংশ আজও বর্ত্তমান) কিন্তু তাঁর এই নূতন রাজধানীর নাম ছিল "প্রবরপুরা"। হুয়েনসাং যখন কাশ্মীরে আসেন তখন এই

প্রবরপুরাই রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট ললিতাদিত্য; এঁর অপর নাম মুক্তাপীড় (৬৯৯—৭৩৬ খৃঃ অব্দ)। ললিতাদিত্য নিজ শৌর্য্যবলে রাজ্যের সীমানা কাশ্মীরের বাইরে বহুদূর বিস্তৃত করেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগ তিনি জয় কোরে কনৌজ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, পশ্চিমে আফগানিস্থান দখল কোরে তারও পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার বহু অংশ এবং উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত তিনি দখল করেন। তাঁর প্রতাপে বিরাট চীন রাজ্যের তদানীন্তন টাং বংশীয় সম্রাট তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সন্ধি স্থাপন করেন এবং মুক্তাপীড় চীন দরবারে নিজ দূত প্রেরণ করেন। চীনা দরবারের ইতিহাসে মুক্তাপীড় মুটো-পী নামে উল্লিখিত আছেন। [মুক্তাপীড়ের জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাপীড়ও (৭১৩ খৃঃ অব্দে) চীন দরবারে দূত পাঠান। এঁর চৈনিক নাম ছিল চেন টো-লো-পি-লি। টাং বংশের ইতিহাসে বর্ত্তমান উগার হ্রদ ও অতীতের মহাপদ্ম হ্রদকে মো-হো-টো-মো-লুং, প্রবরপুরাকে পো-লো-ঔ-লো-পো-লো এবং বিতস্তা নদীকে মি-না-সি-টো নামে উল্লেখ কোরেছে।] দীর্ঘ বার বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন কোরে ললিতাদিত্য প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে তিব্বত দিয়ে কাশ্মীরে ফিরে এসে নূতন রাজধানী স্থাপন কোরলেন 'পরিহাসপুর'—যা ক্রমে দাঁড়াল পরশপুর এবং পরে সাদিপুরা—যা এখনও কাশ্মীরের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র।

এই নূতন রাজধানীকে জাঁকিয়ে তোলবার জন্য ললিতাদিত্য পুরাতন রাজধানী প্রবরপুরাকে ধ্বংস কোরলেন। পহলগামের পথে মাটনের কাছে পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির "মার্ত্তণ্ডের" মন্দির ললিতাদিত্যের নির্ম্মিত বলে অনেকের বিশ্বাস। ঐ মন্দিরের আজও যে ধ্বংসাবশেষ আছে তা থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে সে আমলে স্থপতি কলায়, কারু শিল্পে, নির্ম্মাণকৌশলে কাশ্মীরীরা কত অগ্রসর ছিল। মার্ত্তণ্ডের মন্দির অবশ্য নির্ম্মিত হয় ললিতাদিত্যের বহু পূর্ব্বে, তবে তিনি পরে এর অনেক সংস্কার সাধন করেন। ললিতাদিত্যের পর উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজা অবন্তী-বর্ম্মণ (৮৫৫-৮৮৩ খৃঃ অব্দ); ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। অবন্তীপুরের দুটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও এঁর কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়ে দেয়। কালপ্রবাহে এখানের গ্রাম মন্দির সমস্তই ভূগর্ভে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য পরবর্ত্তী মুসলমান আমলে এই সব মন্দিরকে যতদূর সম্ভব ধ্বংস করা হয়েছিল, তারপর অবহেলায় স্বাভাবিক ভাবেই কালক্রমে এগুলি ভূগর্ভে লীন হয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে মাটি সরিয়ে এই মন্দিরের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এদের বিরাটত্ব ও স্থাপত্য কৌশল আজও দর্শকের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। অবন্তীবর্ম্মণের এক ইঞ্জিনিয়ার সূয্য (হয়ত বা সূর্য্য) বিতস্তার অতিরিক্ত জল বর্ত্তমান সোপুর সহরের পাশ দিয়ে নিকাশের ব্যবস্থা কোরে স্থানীয় অধিবাসীদের

প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর নামেই এ গ্রামের নাম হয় সূয্যপুর—ক্রমে তা রূপান্তরিত হোয়েছে সোপুরে।

৮৮৩-৯০২ সালে কাশ্মীর পড়ল এক খামখেয়ালী অত্যাচারী রাজার হাতে, এঁর নাম শঙ্কর বর্ম্মণ। তিনি এক নূতন রাজধানী স্থাপন কোরলেন বর্ত্তমান পত্তন বা পট্টনের কাছে এবং নূতন রাজধানীর সমৃদ্ধির জন্যে পূর্ব্বপুরুষ ললিতাদিত্যের অনুকরণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী পরিহাসপুরকে ধ্বংস কোরলেন। রাণী দিদ্দা (৯৫০-১০০৩ খৃঃ অব্দ) গজনীর মামুদের নিষ্ঠুর আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। এর পরই ধীরে ধীরে দুর্ব্বল রাজাদের হাতে পড়ে কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হোয়ে পড়ল—দূরবর্ত্তী দেশগুলি ক্রমে প্রধান হয়ে কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল; কাশ্মীরেও একের পর এক নূতন রাজবংশের পত্তন ও পতন ঘটল।

রাজা সিংহদেও (১২৯৫—১৩২৫ খৃঃ অব্দ) এর রাজত্বকালে তাঁর দরবারে এল পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের তিনটি আশ্রয়প্রার্থী—তিব্বতের রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'রানচেন', দরদীস্থানের শাসক 'লঙ্কার চক' এবং সোয়াটের বিখ্যাত পীর ফুরশার পৌত্র 'শাহমীর'। এই তিন জন আশ্রয়প্রার্থীই পরে আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ কোরে কাশ্মীরে হিন্দু সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত করে এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করে। রাজা সিংহদেও এর সময় (১৩২২ খৃঃ অব্দে) তুর্কীরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। দুর্ব্বল রাজা এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী রামচাঁদ

(রামচন্দ্র ?) রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান। তুর্কীরা লুঠতরাজ সেরে ফিরে গেলে রামচাঁদ রাজ্যে ফিরে আসেন। তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থী বিশ্বাসভাজন রাণচেন এক গভীর রাত্রে প্রধান মন্ত্রী রামচাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। তার এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার সহায় ছিল সোয়াটের শাহমীর এবং কয়েকজন লাদাকী। রামচাঁদকে হত্যা কোরে রাণচেন নিজেকে কাশ্মীরের রাজা বোলে ঘোষণা করে এবং রামচাঁদের সুন্দরী কন্যা কুটরাণীকে বিবাহ করে। বিবাহের পর রাণচেন ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ কোরে রাণচেন সা' থেকে সদর-উদ্দিন নাম নিলে। এই ধর্ম্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হোল এবং যথাসম্ভব হিন্দুদের নির্য্যাতন সুরু কোরল। ভাগ্যক্রমে সদরউদ্দীন মাত্র আড়াই বৎসর রাজত্ব কোরে ১৩২৭ খৃঃ অব্দে মারা যায়। রাণচেনের মৃত্যুর পর পলাতক রাজা সিংহদেও এর ভাই উদ্যানদেও কিস্তওয়ার থেকে ফিরে এসে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং বিধবা রাণী কুটরাণীকে বিবাহ করেন। প্রায় ১৫ বৎসর রাজত্ব কোরে উদ্যানদেও মারা গেলে রাণী কুটরাণী নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শাহমীর সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে রাণীকে সরিয়ে নিজেকে রাজা বোলে প্রচার কোরল এবং কুটরাণীকে বিবাহের প্রস্তাব কোরল। কুটরাণী আত্মহত্যা করে এ গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা কোরলেন। এইভাবে বিশ্বাসঘাতক শাহমীর ধর্ম্মত্যাগী রাণচেনের পর

কাশ্মীরে মুসলমান সুলতানীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। রাজা হোয়ে শাহমীর নাম নিলেন সামসুদ্দিন। এই বংশের অন্যতম সুলতান সুলতান সেকেন্দর (১৩৯৪-১৪১৭ খৃঃ অঃ) তার হিন্দু-বিদ্বেষ এবং হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য আজও স্মরণীয়। কাশ্মীরের কোন হিন্দু মন্দির এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নাই। কোরাণ বা তরবারী এই ছিল হিন্দুদের প্রতি তার নির্দ্দেশ। ইসলাম গ্রহণ না করলে মৃত্যুকে বেছে নিতে হবে অথবা লঘু শাস্তি হিসাবে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হোতে হবে। এই অত্যাচারী ধর্ম্মোন্মাদ সুলতানের আমলে কাশ্মীরের হিন্দুদের অনেকেই বাধ্য হোয়ে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ও প্রজাদের মধ্যে এইভাবে ঘোটল ধর্ম্মান্তর! কাল-চক্রে সুখ ও দুঃখ অবিরাম চলেছে একের পর এক—যেমন তা' ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি তা' জাতি ও দেশের পক্ষে। ধর্ম্মোন্মাদ অত্যাচারী সেকেন্দারের পর কাশ্মীরের সুলতান হোলেন উদার, মহৎ, ধার্ম্মিক, প্রজাবৎসল সুলতান জৈন-উল-আবদীন (১৪২০-১৪৭০ খৃঃ অব্দ)—এঁর মহত্ত্ব, সমদর্শিতা, শৌর্য্য এবং প্রজাবাৎসল্য আজও কাশ্মীরে প্রবাদের মত চোলে আসছে।

জিজ্ঞাসু পাঠকদের বলে রাখা ভাল কল্হনের রাজতরঙ্গিনীই কাশ্মীরের একমাত্র ইতিহাস নয়। তবে এইটাই প্রথম প্রামাণিক ইতিহাস। রাজা হর্ষের (১০৮৯-১১০১খৃঃ অঃ) মন্ত্রী ব্রাহ্মণ চম্পকের পুত্র এই কল্হন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক হেলারাজা (৮ম শতক) রত্নাকর (৮৭২-৯০০ খৃঃ অব্দে

রাজা অবন্তীবর্ম্মার সমসাময়িক) এবং রাজা কলসের (১০৬৭-১০৮৯ খৃঃ অঃ) আমলের ক্ষেমেন্দ্রের (৯৯০-১০৬৫ খৃঃ অঃ) ইতিহাস থেকে প্রচুর উপকরণ নিয়ে রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। শুধু যথার্থ ইতিহাস হিসাবেই নয়, একখানি প্রাচীন কাশ্মীরী সংস্কৃত সাহিত্য হিসাবেও 'রাজতরঙ্গিনী' আজ আদৃত।

কল্হনের দীর্ঘ চারশো বছর পর স্থলতান জৈন-উল-আবদীন তাঁর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির চেষ্টায় পুনরায় [illegible] বিচ্ছিন্ন সূত্রকে তাঁর সময় পর্য্যন্ত যোগ করবার ভার দেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জোনারাজকে এবং ফার্সী ভাষায় মোল্লা আহম্মদকে। এর পর পণ্ডিত শ্রীবর সংস্কৃতে ফতেসাহার সিংহাসন লাভ পর্য্যন্ত (১৪৮৬ খৃঃ অঃ) ইতিহাস রচনা করেন। তারপর "রাজাবলী পতাকায়" ১৫৮৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় সম্রাট আকবর কাশ্মীর দখল করেন। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আকবর সংস্কৃতে তাঁর আমলের ইতিহাস লেখার ভার দেন প্রিয়ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণকে। এর পরও হায়দার মালিক (১৬৫০ খৃঃ অঃ) নারায়ণ কাউল (১৬১০ খৃঃ অঃ) মহম্মদ আজম (১৭৪৭ খৃঃ অঃ) বীরবল কাচরু (১৮৫০ খৃঃ) প্রভৃতি অনেকেই ইতিহাস রচনার এই ধারাকে বহমান রেখে এসেছেন।

কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের প্রথম থেকেই ফারসী রাজভাষা এবং সরকারী ভাষা, কিন্তু এখানের হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায় সংস্কৃতকে সযত্নে রক্ষা করায় ক্রমে দুই ভাষার কিছু সংমিশ্রণ হোয়েছে মাত্র—ভারতের অন্যান্য অংশের মত সংস্কৃত অবহেলিত

হোয়ে লুপ্ত হয় নাই। কাশ্মীরের মুসলমান তাদের কথ্য ভাষার মধ্যে আজও স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার করে অপবিত্র, সাধু, লোভ, ত্যাগ, স্নান, সংকল্প, ধ্যান, নির্ম্মল, রাজহংস, কেশ, সুন্দরী, আশা, প্রভাত প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ।

পরদিন প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙ্গলো, মিষ্টি সোণালী রোদে ওপরের অসীম আকাশ চকচক কোরছে, কিন্তু সামনের কুহেলি মাখান শ্যামল সমতল ভূমিতে এবং হ্রদের নিথর কালো জলের আবছা বুকে তখনও যেন নিদ্রালসা নিশীথিনী তার অনাবৃত সৌন্দর্য্য নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে অঙ্গ এলিয়ে শুয়ে আছে; সূর্য্যা-লোকের সজীবতা তাকে তখনও সচেতন কোরে তোলেনি। পাতলা কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী শ্রান্ত প্রহরীর মত লজ্জাহারী সূর্য্যের লোলুপ স্পর্শ থেকে নিদ্রালসাতা-কে আড়াল কোরে রেখেছে। নৌকার বাইরে এসে দাঁড়ালাম; নীচে স্বচ্ছ জলের ভেতর অনেকখানি দেখা যাচ্ছে—তার মধ্যে ছোট ছোট মাছের ছুটোছুটি; বহু সজীব সবুজ গুল্মলতার ঘেষাঘেঁষি, একধারে বহুদূর বিস্তৃত ডালের স্থির স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশি কুয়াশার কোলে মিলিয়ে গেছে। পায়ের নীচের জল থেকে শীতের সকালে হু হু কোরে ধোঁয়া উঠছে, সেই ধোঁয়ায় সৃষ্টি করেছে কুহেলিকা। সামনে শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের ওপর মহাদেবের মন্দিরচূড়াটাতে শুধু স্বর্ণাভ সূর্য্যালোকের ছোঁয়াচ লেগেছে—যেন স্বয়ং ধ্যানমগ্ন মহাদেব; মাথায় তাঁর চন্দ্রকলার দীপ্তি। আশে পাশের ঠাণ্ডা হাওয়া সঞ্জীবনীর সজীবতা বহন কোরে শিহরণশীল।

শীকারায় ব্যাপারী (পৃঃ ৩৯)

ভাসমান ডাকঘর (পৃঃ ৩৯)

করণসিং বুলেভার্দ ও ডালের খালে
শিকারা শ্রেণী (পৃঃ ৩৯)

'ফতেকদল'। পিছনে সা-হামদান মসজিদ ও
হরিপর্ব্বত দেখা যাচ্ছে। (পৃঃ ৫১)

নৌগৃহে থাকার প্রধান সুবিধা সহরের রাস্তা ঘাটের ধূলির মালিন্য থেকে দূরে থাকা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত রূপ ও রস নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করা। সহরের হোটেলে বাস কোরে সত্যকার কাশ্মীরকে ঠিকমত দেখা যায় না, পরে হোটেলে বাস কোরে এ অভিজ্ঞতা আমরা লাভ কোরেছিলাম।

ক্রমে দিনমণির দীপ্তির সঙ্গে সুরু হোল কর্ম্মকোলাহল— সামনে পীচ বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তা "করণসিং বুলেভার্দে" টাঙ্গা, মোটর, লরীর ছুটোছুটি দাপাদাপি। সামনের খালে ছোট বড় নৌকা, শীকারায় গতায়াত কোরতে লাগলো সব্জীওয়ালা, ফুলওয়ালা, কেকওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, দর্জ্জি, ধোপা, ফটোগ্রাফার, শালওয়ালা, কাঠের কাজের ব্যাপারী; কে নয়? এটা যেন একটা ভিন্ন জগৎ। আজকাল এমন কি ভাসমান ডাকঘরও আপনার ভাসা বাড়ীর দরজায় এসে ডাক বিলি করে, খাম পোষ্টকার্ড বিক্রী করে। সহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কি বা দরকার? সহরের সব রকমের ব্যাপারীই যাচ্ছে তাদের পণ্য নিয়ে এই সব জল পথ দিয়ে। চোখে চোখ পোড়লে ত কথাই নাই, না পোড়লেও ক্ষতি নাই— নিজেরাই ডেকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কোরে অতি বিনয়ের সঙ্গে সেলাম কোরে, কেউবা "জয় হিন্দ" বলে আলাপ জমিয়ে উঠে আসবে তার পণ্যের পসরা নিয়ে আপনার নৌকায়; প্রয়োজন নেই বলে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান কোরলেও রেহাই নাই; নাই বা থাকলো আপনার প্রয়োজন, দেখতে ত কোন

দোষ নাই। কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছেন, দেখুন না কাশ্মীরের সামগ্রী ; পছন্দ যদি কিছু নাই হয় তাতেই বা কি ; সে খুসী হোয়ে চোলে যাবে। কিন্তু একবার তার পণ্যের পসরা পেতে বোসলে, কাশ্মীরী ব্যবসাদারদের সৌজন্য এবং বাকচাতুর্য্যের প্রভাব এড়িয়ে কিছু না কেনা বড় কঠিন ব্যাপার। তারা যেটার দাম বোলবে ২০৲ টাকা, দেখবেন সেটা ৮।১০৲ টাকায় নয়ত ৫৲ টাকাতেই কিনে বোসেছেন।

নারী ও পুরুষ দেখতে যেমন সুশ্রী তেমনি সৌজন্যও এদের। অবশ্য বেশ ভূষায় আচার আচরণে এরা বড় নোংরা ; কিন্তু তার কারণটাও জানলে মন বিরূপ না হোয়ে ব্যথিতই হোয়ে ওঠে। কাশ্মীরী ব্যবসাদাররা ঠগ্ বোলে দুর্নাম অর্জ্জন কোরেছে ; স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশই যৌন ব্যাধিতে ভোগে, স্নান করে কালে কস্মিনে। কিন্তু বদনাম কুড়িয়েছে বোধ হয় বাধ্য হোয়ে। অধিকাংশ কাশ্মীরী অত্যন্ত দরিদ্র। ডোগরা রাজবংশের আমলে এখানে সম্পত্তির মালিক ছিল অধিকাংশই হিন্দু, মুসলমানরা ছিল শুধু ক্ষেত-মজুর নয় দিন-মজুর। তারা বছরের পর বছর ক্ষেতে চাষ কোরত, কিন্তু তাতে কোন সত্ত্ব তাদের ছিল না। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯৫ জন গ্রাম্য চাষী—তারা থাকে গ্রামে, অভাবে অনটনে তাদের দিন চলে। সহরের বড় চাকরী ও ব্যবসা মূলতঃ হিন্দুদের হাতে—তারা শিক্ষিত, ধূর্ত্ত, রাজঅনুগৃহীত ও রাজ-পুরুষদের পৃষ্ঠপোষিত। তাদের বাদ দিয়ে আর যারা ব্যবসা

গাঁয়ের মেয়ে (পৃঃ ৭১)

শঙ্করাচারিয়ার মন্দির—শ্রীনগর

(পৃঃ ৪৭)
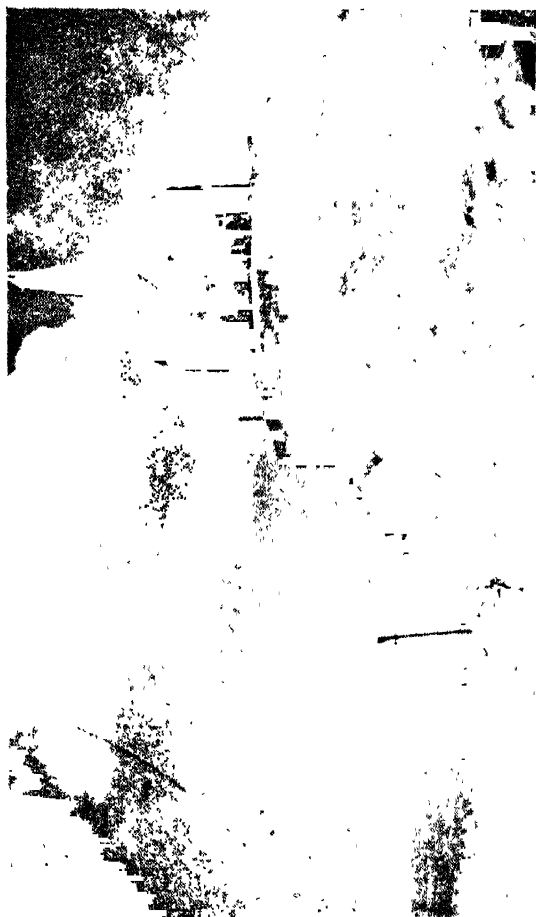
করে তারাই হোল এই সব ছোটখাট ব্যবসায়ী—যারা শীকারায় চোড়ে শীকার করে। কাশ্মীরীরা ত তাদের খরিদ্দার নয়, তাই তাদের উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হোল কাশ্মীরে ভ্রমণকারীর দল—যারা এখানে খরচ কোরতেই এসেছে এবং যাদের অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া সহজ। এই ব্যবসার জীবনকালও খুব সংক্ষিপ্ত, যতদিন ভ্রমণকারীর দল থাকবে ততদিন। কাজেই অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে ব্যবসা কোরে পরিবার প্রতিপালন কোরতে হোলে চড়া দাম নেওয়া ছাড়া পথ কৈ! কিন্তু বর্ত্তমান সরকার সেণ্ট্রাল মার্কেট এবং "এম্পোরিয়াম" কোরে এখন প্রত্যেক জিনিষের দামের মোটামুটি একটা মাপকাঠি ধার্য্য কোরে দেওয়ায় ভ্রমণকারীদের ঠকবার ভয় অনেকটা কম। শীকারায় ফেরীওয়ালার কাছ থেকে অথবা বাজারে কিছু কেনার আগে এই দু'জায়গায় দাম-দর দেখে শুনে এলে বেশী ঠকবার ভয় থাকে না।

এদের কুৎসিৎ ব্যাধির জন্যে দায়ী এদের অজ্ঞতা এবং কিছু পরিমাণে বিদেশীর দল। কাশ্মীরী সুন্দরীদের অসাধারণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হোয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে বিদেশীর দল এখানে এসেছে, শত্রুরূপে বন্ধুভাবে পর্য্যটক হিসেবে। কাশ্মীরের ওপর বরাবর চোলেছে বর্ব্বর শত্রু সৈন্যের আক্রমণ ও উৎপীড়ন—তার ফলে সমাজ জীবন হোয়েছে বারবার বিপর্য্যস্ত; এর ওপর দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার আবর্ত্তে বর্ত্তমান চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুযোগ এরা পায় নাই। গ্রামে আজও জল পড়া, জড়ি বড়ি কবচ দৈব দিয়েই সব রোগের চিকিৎসা

হয়, কাজেই বংশানুক্রমিক যৌনব্যাধি আজ ব্যাপক হোয়ে ছড়িয়ে গেছে। অবশ্য একথা বলা দরকার যে আজকের দিনেও কাশ্মীরী মেয়েদের—কি হিন্দু কি মুসলমান—লজ্জাশীলতা, শালীনতাবোধ, পর্দ্দা ইত্যাদি দেখে মনে হয় কাশ্মীরী সুন্দরীরা বিদেশীর দৃষ্টি থেকে সজাগ ভাবে সন্ত্রস্ত হোয়ে দূরেই থাকার চেষ্টা করে; বিদেশীর সামনে নিজেদের প্রচার করার চেষ্টা এদের বেশভূষায় চালচলনে ইঙ্গিতে ইসারায় একান্তই দুর্লভ। রাস্তাঘাটে বেশ বয়স্কা ছাড়া কমবয়সী মেয়ে চোখেই পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ তারা আপনার সামনে পড়ে গেলে ক্ষিপ্র হাতে মাথার ঘোমটা টেনে দেবে, নয়ত দ্রুত আত্মগোপন কোরবে। অবশ্য ইদানিং শ্রীনগরে মেয়েদের স্কুল ও কলেজ হোয়েছে—কাজেই সালোয়ার, কুর্ত্তা, গ্যারারা বা শাড়ী শোভিতা কলেজী আধুনিকাদের সহরের পথে ঘাটে পথিকের চোখ ঝলসাতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণ মানুষের ব্যবহারের ও বেশের মালিন্যের জন্য দায়ী—দারিদ্র্য এবং আবহাওয়া। পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ার আর্থিক স্বাচ্ছল্য অধিকাংশেরই নেই; তার ওপর এখানের দারুণ শীত বছরের প্রায় ৮ মাস প্রত্যেককে রাখে ঘরে বন্দী কোরে। প্রায় ৮ মাস যাদের স্নান করা সম্ভব নয়, বাকী ৪ মাস স্নান কোরে তাদের লাভ কি? শ্রীনগরের আবহাওয়ার উত্তাপের হিসেবটা এখানে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভ্রমণেচ্ছুদেরও এটা কাজে লাগবে।

	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	মধ্যমান	
১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী—	১৫°	৪৫°	৩৫°	ফাঃ হিঃ
১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ্চ—	২০°	৫০°	৪০°	,,
১৫ই মার্চ্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল—	৩০°	৬৫°	৪৮°	,,
১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে—	৩৫°	৮০°	৫৫°	,,
১৫ই মে থেকে ১৫ই জুন —	৪৫°	৮৫°	৬৫°	,,
১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই—	৫০°	৯৫°	৭৫°	,,
১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট—	৫৫	৯০°	৮০°	,,
১৫ই আগষ্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর—	৪৫°	৮৫°	৭০°	,,
১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর—	৪৫°	৭০°	৬০°	,,
১৫ই অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বর —	৩৫°	৬০°	৫০°	,,
১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর—	২৫°	৫০°	৪৫°	,,

ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৷৩৷৹ মাস সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, মার্চ্চে বরফ গলে ও এপ্রিল পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইতে থাকে; মে মাসের আবহাওয়া আনে উষ্ণতা; বেড়াবার পক্ষে মে জুন ভাল সময়। জুন থেকে আগষ্ট হোল এখানের গ্রীষ্মকাল; তখন অবস্থাপন্নরা গুলমার্গ, পহলগাম প্রভৃতি আরও উঁচু সহরে গিয়ে গরম থেকে বাঁচেন। কাশ্মরীরা ঠাণ্ডায় থাকতে অভ্যস্ত বোলে এই গরমেই ত্রাহি ডাক ছাড়ে, জুলাই আগষ্টে খাটিয়া বার কোরে ছাদে ফুটপাথে শোয়—আর গরমে আইঢাই করে। বৈশাখে নিসাদবাগে একটী বৈশাখী মেলা বসে। শ্রাবণে 'ছুবার'

তীর্থ অমরনাথ যাত্রার সময় (শ্রাবণী পূর্ণিমা) কারণ তখন চারিদিকের উঁচু পাহাড়ের মাথার বরফ গলে। এই সময় শ্রীনগরে সরকারী এবং সেন্ট্রাল মার্কেট ও প্রদর্শনী (state exhibition) খোলা হয় এবং তা খোলা থাকে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত। সেপ্টেম্বর ও প্রথম অক্টোবর হোল কাশ্মীর বেড়াবার সব চেয়ে ভাল সময়।

জুলাই আগষ্টের বৃষ্টির ফলে বর্ষাস্নাতা কাশ্মীর সুন্দরী তখন পূর্ণ যৌবনা, দিকে দিকে ফুল, ফল ও ফসলের প্রাণস্পন্দন, আকাশ থাকে মেঘ মুক্ত, বায়ু নির্ম্মল, বিভিন্ন বাগানের বুকে তখন বর্ণ বৈচিত্রের ফুলঝুরি, পাহাড়ী অধিত্যকাগুলির কোলে সবুজ সমতলভূমিতে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে আপন খেয়াল খুসীমত রচনা করেন নানা বনফুলের বীথিকা, গাছে গাছে সরস সুপক্ক আপেল বাগুগোসা, নাস্পাতি, বেদানা, আখরোট, পীচ : হাওয়া তখন শীত ও গ্রীষ্মের সব তীক্ষ্ণতা রুক্ষ্মতা ত্যাগ কোরে বিদেশী অতিথিদের মিষ্টি হাতে সাদরে সম্ভাষণ জানায়।

অক্টোবরের শেষাশেষি ঠাণ্ডা পড়ে, নভেম্বরের শেষে বা প্রথম ডিসেম্বরে তা তুষারাপাতে পরিণতি লাভ করে। বরফ বিলাসী বিদেশীরা তখন গুলমার্গ প্রভৃতি উঁচু সহরে স্কী (ski) খেলতে যান। তুষারাচ্ছন্ন এতখানি সমতলভূমি ভারতের অন্যত্র দুর্লভ ; তাই শীতের খেলার জন্য এবং পাহাড়ী বরফে বেড়ানর জন্যে (trekking) শীতের কাশ্মীর বিদেশীদের বিলাস ভূমি। শীতের সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ

চেনার পাতা লালচে হোতে সুরু করে; মাঠের ঘাস, পপলার শ্রেণী বিবর্ণ, বিপত্র হোতে থাকে। নভেম্বরে চেনার পাতা একেবারে লাল হোয়ে ওঠে, এদেশের কবির ভাষায় বলে চেনারের গাছে তখন আগুন লাগে। আর এমনি লাল আবিরের হোলিখেলা চলে তখন পামপুরের কুঙ্কুমের ক্ষেতে। কুঙ্কুম কুসুমগুলি পরিপক্ক হোয়ে এই সময় ছড়িয়ে থাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মাঠের বুক জুড়ে।

প্রথম দিনটা পথের ক্লান্তি কাটাতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নূতনত্বে মশগুল হোতে, আর প্রথম হেঁসেল পাতার হাঙ্গামা পোয়াতেই কেটে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে গরম স্যুটের ওপর ওভারকোট চাপিয়েও কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পোড়লাম শঙ্করাচারিয়ার দিকে। শীকারা থেকে ডাঙ্গায় নেমেই সামনে একটা টাঙ্গা পাওয়া গেল। এদিকের টাঙ্গাগুলি মোটামুটী ভাল, অনেকগুলি বেশভালই। পশ্চিমে সবার চেয়ে লাহোরের টাঙ্গার খ্যাতি ছিল, বোধ হয় তাদেরই কেউ কেউ এখন ছিটকে এসেছে এখানে। শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের পাদমূলে বেশ খানিকটা ঘন বসতি—বলা বাহুল্য এরা সবাই মুসলমান। এদের কবরস্থান গ্রামের সীমানা থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমে পাহাড়ের ওপরের খানিকটা পর্য্যন্ত এসেছে। এই অঞ্চল থেকে হরি পর্বতের মধ্যবর্ত্তী সহরই "প্রবরপুরা" বা আদি শ্রীনগর। বসতি ছাড়িয়ে এসেই পাহাড়ে উঠবার রাস্তা। গাড়ী থেকে নেমে দেখি ভাঙ্গানী নাই, টাঙ্গাওয়ালার কাছেও নাই। অত ভোরে

অন্যত্র ভাঙ্গানী পাওয়া সম্ভব নয়। গাড়োয়ান বোল্লে সে টাকা ভাঙ্গিয়ে বাকী আট আনা যেখানে আমরা তার গাড়ীতে উঠেছিলাম সেখানের পেট্রল পাম্প ওয়ালার কাছে রেখে দেবে, পয়সা নিয়ে সে পালাতে পারে না—কারণ সে ঐ জায়গারই লোক। বলা বাহুল্য বাকী পয়সা পেট্রলপাম্পে সে কখনও জমা দেয় নাই।

শঙ্করাচারিয়া পাহাড়টি এক হাজার ফিট উঁচু। এতে উঠবার তিনটি রাস্তা আছে; দুর্গানাগ, আইতগাজী ও গাগরীবল এর দিক থেকে। আমরা করণসিং বুলেভার্দ দিয়ে গিয়ে সাধারণ প্রচলিত রাস্তা দিয়ে উঠলাম। প্রথম খানিকটা বাঁ দিকে অনেকখানি কবরস্থান। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো শেষ পর্য্যন্ত চড়াই কোরতে। পথ প্রশস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে 'পাকদণ্ডী' বা পায়ে চলা সোজা পথও আছে। এই পথগুলি দেখতে বেশ সোজা, কিন্তু অনভ্যস্তর কাছে বিশেষ সজুতা পায়ের পক্ষে বিষম বিপজ্জনক। পূর্বে মন্দির থেকে নীচে পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে আলো ছিল —সন্ধ্যায় তা যখন জ্বলতো দূর থেকে মনে হোত আলোর একছড়া মালা। এই আলোকসজ্জার ব্যয় বহন কোরতেন মহীশূরের মহারাজা। যুদ্ধের সময় থেকে এ আলোকসজ্জা বন্ধ করা হোয়েছে শুনলাম; এখন ত আর দেশীয় রাজাই নেই, কাজেই রাজার দানও নেই। এখন শুধু মন্দিরের মাথার চূড়ায় একটি আলো জ্বলে; বহুদূর থেকে দেখা যায় তার উজ্জ্বল দীপ্তি। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় একটুখানি সমতল জায়গা,

ত্ব একটা গাছ আছে, পূজারীর একটি ছোট ঘর আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের পাথর বাঁধানো আটকোণা অঙ্গনে উঠতে হয়। তারপর আরও ৫।৬টি ধাপ উঠে মন্দির-দ্বার।

পাহাড়ের ওপর থেকে একদিকে প্রায় সারা শ্রীনগর চোখে পড়ে, অন্যদিকে ডাল হ্রদ, হ্রদের তীরে ভূতপূর্ব মহারাজার আধুনিকতম প্রাসাদ। চারদিকের সমতলের মাঝে হাজার ফুট উঁচু থেকে সহর ও বিতস্তার বাঁক পেরিয়ে দৃষ্টি চলে যায় দিকচক্রবালে—সবুজ সমতলভূমি, তার বুকে বিসর্পিল বিতস্তা ও তার শাখা-প্রশাখা ; অন্যদিকে আকাশের কোল ঘেঁষা 'মহাদেব' পাহাড়ের পা ছুঁয়ে পোড়ে আছে ডালের নিথর স্বচ্ছ জল একখানা বিরাট আয়নার মত ; চতুর্দ্দিকের শোভা তার বুকে বিম্বিত হোয়ে দ্বিগুণিত হোয়ে ওঠে ; ওপরে নির্ম্মল নীল আকাশ, চারিদিকে ঝকঝকে মিষ্টি রোদ ; কোনখানে নীচের সমতলভূমি একখানা পাতলা মেঘ বা কুয়াসার মসলিনে ঢাকা পোড়ে আবছা দেখা যায়, আবার মেঘ সরে গেলে তা সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে।

শ্রীনগরী সহরের প্রায় সব জায়গা থেকেই পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরটিকে দেখা যায়—মনে হয় স্বয়ং শঙ্কর সদা জাগ্রত শান্ত্রীর মত সহরটির ওপরে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। 'শঙ্করাচার্য্য'' নামের স্থানীয় উচ্চারণে এর নাম আজ ''শঙ্করাচারিয়া'। বৌদ্ধ নাস্তিকতা রোধ কোরে বৈদিক ও শৈব মত প্রচার কোরে যখন শঙ্করাচার্য্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন তখন সংস্কৃত

সাহিত্যের অন্যতম পীঠস্থান এই কাশ্মীরেও তাঁকে আসতে হয় (৯ম শতাব্দীতে)।

শ্রীনগর থেকে ৭৪ মাইল দূরে দুর্গম পাহাড়ের কোলে সারদা দেবীর মন্দির ও সারদা গ্রাম। সোপুর থেকে বাসে হান্দোয়ারা দিয়ে বা সোজা 'ত্রেগাম' গিয়ে সেখান থেকে (৩০ মাইল) হেঁটে ২॥০ মাইল দূর লোদ্রোয়াণা যেতে হয়। লোদ্রোয়াণা থেকে ঘোড়া, কুলী বা ডাণ্ডী কাণ্ডীর ব্যবস্থা কোরে পাহাড়ী রাস্তা চড়াই কোরে দুধনিয়াল হোয়ে সারদা যেতে হয়। ১৯৩০ সালে আমি এখানে গিয়েছিলাম ; এবার সোপুর গিয়ে শুনলাম সারদা পোড়েছে পাকিস্থানের কবলে ; সেখানের কোন খবর এখানে আর আসে না। সেখানের পণ্ডিতরা বেঁচে কেউ নেই বোলেই এধারের লোকের বিশ্বাস—এ অঞ্চলের কেউ আর পাকিস্থানের এলাকায় যাবার সাহস রাখে না। সেদিনও যা ছিল এক, আজ তা সম্পূর্ণ পৃথক, পরস্পরের মহাশত্রু। সারদায় একটা জনশ্রুতি ১৯৩০ সালে শুনেছিলাম, হয়ত এখন যেতে পারলেও শোনা যেত।

কাশ্মীরের মধ্যে সারদা তীর্থ একটী মহাপীঠ (একান্ন পীঠের অন্যতম) ; এই পীঠস্থানের পণ্ডিতদের পরাজিত কোরে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরে স্বমত প্রতিষ্ঠা কোরতে সক্ষম হন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য যখন সারদা দেবীর মন্দিরে ঢুকতে যান, তখন দেবী তাঁকে ঢুকতে নিষেধ করেন, কারণ তিনি অপবিত্র। সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে যখন শ্রীশঙ্করাচার্য্য

'শঙ্করাচারিয়া' থেকে বিসর্পিল বিতস্তা (পৃঃ ৪৭)

শঙ্করাচারিয়া থেকে ডাল হ্রদ (পৃঃ ৪৭)

বিতস্তার তীরে সা-হামদান মসজিদ

(পৃঃ ৫৩)

কামশাস্ত্র শেখার উদ্দেশ্যে এক মৃত মহারাজার দেহের মধ্যে নিজের আত্মা সঞ্চালিত কোরে সেই দেহের মধ্য দিয়ে পার্থিব ভোগ ও নারীসঙ্গ করেন তখন তাঁর আত্মা অপবিত্র হোয়েছিল অতএব তিনি মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নন; এই ছিল দেবীর বক্তব্য। আত্মা অপবিত্র হয় কিনা, আত্মা ভোগ করে কিনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যাখ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনদিন ক্রমাগত বিচার চলে এবং শেষে দেবী সারদা শঙ্করাচার্য্যের কাছে পরাজিত হোয়ে তাকে মন্দিরে প্রবেশের ও পূজার অনুমতি দেন। এই থেকেই বোঝা যাবে শঙ্করের বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদের কি উচ্চ ধারণা ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের এই মন্দিরে শিব মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং পরে তাঁর নামানুসারে এই পাহাড় ও শিরের নাম হয় শঙ্করাচার্য্য বা শঙ্করাচারিয়া।

এই মন্দির কিন্তু প্রথম তৈরী হয় প্রায় ২৪০০ বছর পূর্বে খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতকে রাজা গোপাদিত্যের আমলে (খৃঃ পূর্ব ৩৬৮-৩০০)। তাঁর নামানুসারেই বোধ হয় এই পর্বতের তৎকালীন নাম ছিল গোপাদ্রি বা "গোপা পর্বত"। তিনি এখানে জ্যেষ্ঠেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তারপর খৃঃ পূঃ ২০০ শতকে মহারাজ অশোকের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-সম্রাট জালুকা বৌদ্ধ-বিহার হিসাবে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান। বৌদ্ধ স্তূপের স্থাপত্য কৌশলে এই আটকোণা মন্দির নির্ম্মিত হয়। শঙ্করাচার্য্য এখানে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কোরে শৈবমত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করেন এবং তখন থেকে এই পাহাড় ও মন্দিরের দেবতার নাম-করণ তাঁর নামেই হয়। তার পর মুসলমান আমলে এখানের মূর্ত্তি খণ্ডিত হয়। পূর্ব্বের মূর্ত্তির মাত্র পায়ের সামান্য অংশ এখনও বেদীতে রাখা আছে; বাকী অংশ বোধ হয় বিগ্রহদ্বেষী মুসলমান আমলে ধূলিতে বিলীন হোয়েছে। বর্ত্তমানে মন্দিরের অধিষ্ঠিত বিরাট বাণ-লিঙ্গ শিব মহারাজ প্রতাপ সিংহের প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৫।৬ ফিট লম্বা এতবড় বাণলিঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে। পূজার জল নীচে থেকেই আসে, কারণ ত্রিভূজাকৃতি এই পাহাড়টার মাথায় কোন জলাধার বা ঝর্ণা নাই। পূজারী সন্ধ্যার আরতি শেষে নীচে নেমে যায়, রাত্রে কেউ এ জায়গায় থাকে না। মন্দিরের বিরাট পাথরের খণ্ডগুলি অতীতকালে কি ভাবে এই পাহাড়ের মাথায় তোলা হোয়েছিল ভাবলে মনে বিস্ময় জাগে।

মন্দির থেকে নামতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। ফেরার পথে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে গিয়ে আমায় বেশ নাকাল হোতে হোয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড পাথর পাকদণ্ডীর সঙ্কীর্ণ পথ আগলে দাঁড়িয়ে, তার গায়ে শুধু মাত্র একটা পা রাখার মত খাঁজ কাটা, পাথরটাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে একটা পা খাঁজে রেখে, অন্য পা সামনের প্রশস্ততর পথে দিয়ে পার হোতে হয়। যদিও এখন এ রাস্তাটার রেখা রোয়েছে, তবু মনে হোল বর্ত্তমানে এটা পরিত্যক্ত। অনেকখানি নেমে এসে সেই পাথরের বাধা দেখে আবার ফিরে চড়াই কোরে চওড়া

রাস্তা ধোরতে মন চাইল না। আমার স্ত্রীর পায়ে স্লিপার ছিল; সে দুটো খুলে ছুঁড়ে পাথরের ওধারে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে তিনি ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেলেন। আমার পায়ে ছিল মোটা চামড়ার 'শু' ও মোজা। জুতো খোলার হাঙ্গামা না কোরে আমি সেই পাথরের খাঁজে জুতো সমেত পা দিয়ে পার হোতে গেলাম, শক্ত পাথরে শক্ত জুতো গেল পিছলে; পায়ের তলায় প্রায় এক দেড়শ ফিট নীচে আর একটা রাস্তা। পোড়লে অতল গহ্বরে নিশ্চিহ্ন না হোক, হাড়গোড় চূর্ণ হবার পক্ষে তা যথেষ্ট, কাজেই প্রাণ ভয়ে সেই পাথর আঁকড়ে ধোরে অতিকষ্টে আবার সজুতো পাকে পুনস্থাপন কোরে একটা ফাঁড়ার হাত থেকে সেদিন বাঁচলাম।

সহরের বুকের আর একটী পবিত্র পাহাড় হরি পর্ব্বত। উচ্চতায় এটী শঙ্করাচারিয়ার চেয়ে কম, কিন্তু ইতিহাস এরও কম নয়। এর উচ্চতা ৫০০ ফিট। একধারে সহর, অন্য ধারে ডাল হ্রদ। এইটীই পৌরাণিক কাহিনীর জলোদ্ভব দৈত্যকে বধের জন্য সারিকা রূপিণী পার্ব্বতী প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড। আজও এর ওপর সারিকা ভগবতীর মন্দির আছে। সম্রাট আকবর চাক বংশের শেষ সুলতান ইয়াকুবখানের কাছ থেকে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর জয় কোরে নেন এবং এই পাহাড়ের ঢালু গায়ের ওপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। আজও সে দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাহাড়টীর উত্তর ও পশ্চিমে দেখা যায়। দুর্গের মধ্যে একটী আখরোট বাগান,

শুকনো জলাধার এবং বন্দীশালা আছে। এই বন্দীশালায় কাশ্মীরের সেদিনের ভাগ্যনিয়ন্তা সের-ই-কাশ্মীর সেখ আবদুল্লা মহারাজের আমলে বন্দী-জীবন যাপন করেন। মহারাজা শ্রীনগরে এলে এই দুর্গ থেকে তোপধ্বনি কোরে তা জানান হোত। শুধু রামনবমী ও মহানবমীর দিন (দুর্গা পূজার) এর দ্বার সকলের জন্য মুক্ত; এর মধ্যে যেতে হলে ভিজিটার্স ব্যুরো থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়। পাহাড়টী দুটি স্তরে বিভক্ত, উত্তরে দুর্গ এবং পশ্চিম স্তরে সারিকা ভগবতীর মন্দির। কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য বিবর্ত্তনের সঙ্গে এই পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে গড়ে উঠেছে মুসলমানের মস্‌জিদ মকতুমসা এবং বিখ্যাত ফকির আখুনমুল্লা সা'র বা শেখ মদিন সাহেবের কবর। পূর্ব্ব গায়ে দুর্গের কাঠি দরজার কাছে শিখদের গুরুদ্বার—অর্জ্জুনদেবের স্মৃতিপূত মন্দির ছাট্টী পাদসাহী

হিন্দুদের বিশ্বাস দেবী ভগবতীর সঙ্গে সব দেবতাই এই পর্ব্বতে বাস করেন, তাই অনেক ভক্ত সমস্ত পাহাড়টী পরিক্রমা করেন। হরিপর্ব্বতের গায়ে শুধু হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের ধর্ম্মের ইতিহাসই নাই—এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি কি ভাবে মিশে গেছে মন্দির ও মস্‌জিদের স্থাপত্য কলার কৌশলে তা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের মস্‌জিদে বা ইসলামী স্থাপত্যে যে মুসলমানী মিনারের বাহুল্য দেখা যায়, এখানের স্থাপত্যে তার চিহ্ন নাই। হিন্দু মন্দিরের

চারকোনা মন্দির ভিত্তির অনুকরণে এবং সেই ঢঙেই গোড়ে উঠেছে এখানের অধিকাংশ মুসলমানী মস্‌জিদ ও কবর। এর আর একটা কারণ বোধ হয় এই যে কাশ্মীরের প্রাচীন মুসলমানী কীর্ত্তির আজও যা দাঁড়িয়ে আছে, তা সমদর্শী সম্রাট সুলতান-জৈন-উল-আবদীনের আমলের অথবা মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের সময়কার। মুসলমান সংস্কৃতির উগ্রতার চেয়ে সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য এঁদের কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল—তাই হিন্দু স্থাপত্যের কারুকলা ও কৌশল মসজিদে সমাধিতে এঁরা প্রয়োগ কোরতে দ্বিধা করেন নি। তা ছাড়া সহস্রাধিক বৎসর ধোরে হিন্দু সংস্কৃতি ও আদর্শের মধ্যে বাস করার ফলে এ দেশীয় কারিগর বা পরিকল্পনাবিদদের পক্ষে পরবর্ত্তীকালেও হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব এড়ান সম্ভব হয় নাই।

শুধু হরিপর্ব্বতেই নয় কাশ্মীরের বিখ্যাত মসজিদ "শা হামদান" এবং জুম্মা মসজিদেও এই হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ আলি হামদানী বা "শা হামদান" একজন উদারমতাবলম্বী ফকির। তৈমুরলঙ্গের অত্যাচারের ভয়ে মধ্য এশিয়া থেকে ১৩৮০ খৃঃ অব্দে পালিয়ে তিনি কাশ্মীরে আসেন। গুণগ্রাহী সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁকে সমাদরে স্থান দেন এবং এই ফকিরের স্মৃতি সৌধ হিসাবে সম্পূর্ণভাবে কাঠের তৈরী এই চতুষ্কোণ মসজিদটী বিতস্তার তীরে তিনিই নির্ম্মাণ করান। (কেউ কেউ বলেন ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে তৈরী, সেক্ষেত্রে সা হামদান নিশ্চয় ১৩৮০ খৃঃ অব্দের আগে এখানে

আসেন।) এই মসজিদে বিতস্তা থেকে উঠতে জলের ওপরেই মসজিদের ভিত্তির গায়ে আছেন "মহাকালী"। আজও হিন্দুরা সিন্দুর-লেপিত এই মহাকালী মূর্ত্তির পূজা করেন। পূর্ব্বে এই মসজিদের স্থানে ছিল কালীশ্বরীর মন্দির, কোন সুলতান এটা ভেঙ্গে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন কোরেছেন তা সঠিক জানতে পারি নাই। এখনও এই মসজিদের প্রাঙ্গণের মধ্যে কালীর নামে ঝরণা আছে। এজন্য হিন্দুরা আজও মসজিদের ভেতরে এই ঝরণায় যায়, মসজিদের ভেতর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির ভাঙ্গা টুকরো দেখা যায়। জৈন-উল-আবদীন পরে এই মসজিদ সংস্কার ও কিছু অংশ সংযোজনা করেন।

সা হামদানের কথা মনে হোলেই মনে পড়ে তাঁর সমসাময়িক হিন্দু সন্ন্যাসিনী লালেশ্বরীকে। ১৩৬০ কি ১৩৭০ খৃঃ অব্দে এই যোগিনী জন্মগ্রহণ করেন কাশ্মীরের এক সমৃদ্ধ সংসারে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অনাসক্ত সন্ন্যাসিনী। সংসারের মায়ায় বাঁধতে বাপ মা বিবাহ দেন, কিন্তু এমন উদাসিনীর দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্ভব নয়। শ্বশুর, শ্বাশুড়ি এমন কি স্বামীও এই পূজার্চ্চনাপরায়ণা উন্মাদ সন্ন্যাসিনীর ওপর বিরক্ত হোয়ে তাকে সংসার ধর্ম্মে সচেতন করবার জন্যে শারীরিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ কোরলেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে একদিন লালেশ্বরী গৃহত্যাগ কোরলেন এবং কাশ্মীরের পাহাড়ে প্রান্তরে গ্রামে সহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আরাধ্য দেবতার অনুসন্ধানে। শেষে শৈবযোগী সিদ্ধ-শ্রীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। লালেশ্বরী শুধু

যোগীনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সিদ্ধ কবি। ধর্ম্ম ও যোগের মূল তথ্যগুলি তিনি সহজ ভাষায়, গ্রাম্য উপমায় সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন, যা আজও কাশ্মীরের লোক-সঙ্গীতের একটা প্রধান অংশ। যোগের পথে তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান কোরে "পরমশিব"কে পাবার উপায় বোলে গেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও গানে। হিন্দু ধর্ম্মের এই উদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তিনি তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমান সকলের হৃদয় জয় কোরেছিলেন। সা হামদানের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কাশ্মীরবাসী এই ভ্রাম্যমান যোগিনীকে আদর কোরে নাম দিয়েছিল "লালদেদ", জ্ঞানী লালা অথবা লালা অরিফা।

জুম্মা মসজিদের ভিত্তি যদিও মহা-হিন্দু-দ্বেষী সুলতান সিকান্দার ১৩৯৮ সালে স্থাপন করেন, এই বিরাট মসজিদ শেষ করেন জৈন-উল-আবেদীন ১৪০৪ সালে। এই মসজিদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সুলতান আবেদীন যথেষ্ট সম্পত্তিও দান করেন। জুম্মা মসজিদের চারিধারে দেওয়ালের মাঝে মাঝে মিনার থাকলেও, এর চতুষ্কোণ আকার, থাম, কড়ি ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। জুম্মা মসজিদও এখানের অন্যতম দ্রষ্টব্য—কাশ্মীরের বৃহত্তম মসজিদ হিসাবে। কয়েকবারই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। কিছুদিন আগেও শুনলাম প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হোয়েছে শুধু এর সংস্কারে।

কাশ্মীরে সেখ আবদুল্লার পরিচালিত গণ আন্দোলনের গোড়াপত্তনের সঙ্গে জুম্মা মসজিদের স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত।

প্রথম প্রকাশ্য প্রজা বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করা হয় এই জুম্মা মসজিদে। অবশ্য এই সময় মহারাজা হরিসিং লণ্ডনে ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে তিনি এক বিবৃতিতে প্রজাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রবাহ চোলেছিল সাম্প্রদায়িক খাতে। তাঁর বক্তৃতায় কোন ফল হোল না, বরং ক্রমে আন্দোলন বাড়তে লাগলো। এক জনসভায় আবদুল—কাদের নামে এক পাঠান যুবক হিন্দু রাজশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সাম্প্রদায়িক ভাষায় জোরালো বক্তৃতা করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জনসাধারণের উত্তেজনা এড়ানর জন্যে সেণ্ট্রাল জেলে গোপনে তার বিচারের ব্যবস্থা হয়। জনতা কিন্তু বিচারের তারিখ জানতে পারে এবং জেল আক্রমণ করে। তাদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হোলে বিক্ষোভ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং উত্তেজিত জনতা টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, পুলিশ ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য জেল ভাঙ্গার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধ্য হোয়ে গুলি চালায়, ফলে ২১ জন প্রাণ হারায়। কাশ্মীরের প্রকাশ্য গণ-বিদ্রোহের এই হল সূত্রপাত।

শ্রীনগরকে দেখতে হোলে যেমন বিতস্তার দুই তীরবর্ত্তী সহরের ভেতরের বিভিন্ন অংশ দেখা দরকার, তেমনি দেখা

'মার'নালার একাংশ—নৌকায় সব্জীওয়ালারা চোলেছে (পৃঃ ৫৯)

কাশ্মীরে সেখ আবতুল্লার পরিচালিত গণ আন্দোলনের গোড়া-পত্তনের সঙ্গে জুম্মা মসজিদের স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত।

প্রথম প্রকাশ্য প্রজা বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করা হয় এই জুম্মা মসজিদে। অবশ্য এই সময় মহারাজা হরিসিং লণ্ডনে ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে তিনি এক বিবৃতিতে প্রজাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রবাহ চোলেছিল সাম্প্রদায়িক খাতে। তাঁর বক্তৃতায় কোন ফল হোল না, বরং ক্রমে আন্দোলন বাড়তে লাগলো। এক জনসভায় আবতুল—কাদের নামে এক পাঠান যুবক হিন্দু রাজশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সাম্প্রদায়িক ভাষায় জোরালো বক্তৃতা করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জনসাধারণের উত্তেজনা এড়ানর জন্যে সেণ্ট্রাল জেলে গোপনে তার বিচারের ব্যবস্থা হয়। জনতা কিন্তু বিচারের তারিখ জানতে পারে এবং জেল আক্রমণ করে। তাদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হোলে বিক্ষোভ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং উত্তেজিত জনতা টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, পুলিশ ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য জেল ভাঙ্গার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধ্য হোয়ে গুলি চালায়, ফলে ২১ জন প্রাণ হারায়। কাশ্মীরের প্রকাশ্য গণ-বিদ্রোহের এই হল সূত্রপাত।

শ্রীনগরকে দেখতে হোলে যেমন বিতস্তার দুই তীরবর্ত্তী সহরের ভেতরের বিভিন্ন অংশ দেখা দরকার, তেমনি দেখা

'মার'নালার একাংশ—নৌকায় সব্জীওয়ালারা চোলেছে (পৃঃ ৫৯)

ছত্রাবল বাঁধ (পৃঃ ৫৭)

ডাল বিতস্তার বুকে শীকারায় চড়ে তার দুই তীরের দৃশ্য। বিতস্তা নদীর জল-প্রবাহ শ্রীনগরের ব্যবসা বাণিজ্যের মূল ধমনী স্বরূপ। ডাল হ্রদের স্বতঃ উৎসারিত জলরাশি ডাল দরজায় কাঠের ফটক দিয়ে বন্ধ রাখা হয় তার অপচয় নিবারণের জন্যে। ডালের জল একটী খালে প্রবাহিত কোরে তাকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ কোরে সেখানে দুটী কাঠের ফটক করা হোয়েছে, এর নাম 'ডাল দরজা'। প্রথম দরজা খুললে ডালের জল তার মধ্যে ঢুকে দ্বিতীয় দরজা পর্য্যন্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানের জলের উচ্চতা প্রায় ৪।৫ ফিট বেড়ে যায়। জলের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান শীকারা ও নৌকাগুলিও ফটকের মধ্যে ঢোকে। তারপর প্রথম দরজা বন্ধ কোরে ডালের জল আটকে রেখে, দ্বিতীয় দরজা খোলা হয় ধীরে ধীরে, জল কোমে ক্রমে "মার নালার" জলের সঙ্গে সমান হোলে ভেতরের নৌকা ও শীকারাগুলি যাবার জন্য ফটক পুরো খুলে দেওয়া হয়। এইভাবে সারাদিনই কিছুক্ষণ পর পরই ডালের জলকে এবং সেই সঙ্গে মার নালা ও বিতস্তার জলকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। বিতস্তার জলকে আরও নিয়ন্ত্রণ করা হয় সপ্তম সেতুর পর মহারাজ প্রতাপসিংহ নির্ম্মিত ছত্তাবল বাঁধ দ্বারা। ১৯১৬ সালে নির্ম্মিত এই লোহার বাঁধটী বিতস্তার সমস্ত পরিসর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার ফাঁকে মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে জলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সহরের ব্যবসায়ের প্রয়োজন মত জল নদীতে

এইভাবে রাখা হয়, বাকী বাড়তি জল বাঁধের ওপর দিয়ে ছোট জলপ্রপাতের আকারে বয়ে যায়। বর্ষার প্লাবনে বিতস্তার জল যাতে সমতল শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি না কোরতে পারে, এজন্যে উদ্বৃত্ত জল বার কোরে দেবার জন্য একটা বড় খালও আছে। সহরের দুই অংশের যোগাযোগ রাখবার জন্যে এখন বিতস্তা নদীর বুকে আছে সাতটী সেতু। এর এক একটি এক এক রাজার আমলে তৎকালীন কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির নামে তৈরী। এদের নাম যথাক্রমে ঃ—

১। আমীরা কদল—তৈরী করান আমীর খাঁ (১৭৭৩ খৃঃ অঃ)। বর্ত্তমান চলতি নাম "মীরা কদল"।

২। হাব্বা কদল। তৈরী করান ইয়াকুব খান (১৫৫০ খৃঃ অঃ; কেউ কেউ বলেন হব্বি সা) চলতি নাম 'হাবা' বা হাওয়া কদল।

৩। ফতে কদল—তৈরী করান 'ফতে সা' (১৪৯৯ খৃঃ অঃ)

৪। জৈন কদল—তৈরী করান জৈন-উল-আবদীন (১৪২৬ খৃঃ অঃ) চলতি নাম জেন্না কদল।

৫। আলি কদল—তৈরী করান আলি সা (১৪২৬ খৃঃ অঃ)

৬। নাওয়া কদল—তৈরী করান নূর-দীন-খান (১৬৬৭ খৃঃ অঃ)।

৭। সাফা কদল—তৈরী করান সয়েফ-উদ্দীন খাঁন (১৬৭০ খৃঃ অঃ)।

এই কদল বা সেতুগুলির নির্ম্মাণ তারিখ থেকে শ্রীনগরের

প্রথম অবস্থান ও ক্রমপ্রসারের ধারার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিতস্তা থেকে ডাল হ্রদে যেতে গেলে 'মার নালা' হোয়ে বিখ্যাত চীনার-বাগের হাউস বোটের সারি পেরিয়ে ডাল দরজা দিয়ে যেতে হয়। ডাল দরজার পর আবার ছুটো খাল ভিন্নমুখী হয়ে গিয়ে ডালের বড় অংশে পড়েছে; তীরের কাছাকাছি ডাল হ্রদ অগভীর, ডালের গভীরতা ৮ থেকে ২০ ফিট; গ্রীষ্মে ও শীতে তা আরো কমে যায়। জলের ভেতর একরকম শৈবাল জাতীয় গাছ হয়—তার মূল হ্রদের তলার মাটীতে থাকেনা, জলে ভাসে; এগুলি এত ঘন যে এর ওপর মাটী ফেলে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র তৈরী করা হয়। তরমুজ, বিলাতীবেগুন প্রভৃতি নানা ফসল ফলে এই বাগানে। এমনি ভাসা বাগানগুলিকে চারদিকে দড়ি বেঁধে প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করা যায়। এই অস্থাবর স্থাবর সম্পত্তিগুলি সেজন্য মাঝে মাঝে চুরি যায়। সুন্দর ফলন্ত বাগানটী সকালে দেখা গেল চুরি গেছে— আর জায়গা নড় চড় হোলে এদের সনাক্ত করাও কঠিন—কাজেই ফসলের সময় মাঝে মাঝে জলের ওপর মাচা বেঁধে কৃষকেরা সজাগ থেকে এই ভাসমান বাগানগুলি পাহারা দেয়। ডাল হ্রদটী উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল লম্বা, পূর্ব্ব পশ্চিমে চওড়া প্রায় আড়াই মাইল।

শ্রীনগরকে অনেকে ইউরোপের ভেনিসের সঙ্গে উপমা দেন তার জলপথের জন্যে। এ উপমা বাহুল্য নয়, বাস্তব।

শ্রীনগরের জলপথের মূলধারা বিতস্তা ও তার কয়েকটা শাখা এবং ডাল হ্রদ ও তার অঙ্গীভূত বহু বিভক্ত জলপথ। আর এই পথের সবচেয়ে আরামপ্রদ সৌখীন ও দ্রুত যান হোল শীকারা। ছুজন মাঝখানে পাশাপাশি বোসতে পারে এমনি চওড়া এই নৌকাগুলি ছাউনী দেওয়া। ছাউনীর চারধারে রঙীন পর্দ্দা, বোসবার আসনে স্প্রিংএর গদী তা ছোট ছোট আবার বর্ণাঢ্য বনাতে ঢাকা। এক, ছুই বা তিনজন মাঝি দাঁড় দিয়ে এগুলি চালায়। মাঝির সংখ্যা ও সামর্থ্য হিসাবে এর গতি। এগুলির নাম ট্যাক্সী শীকারা। ট্যাক্সী শীকারাগুলিরও খুব জমকালো সব নাম আছে—ফেয়ারী কুঈন, ফ্লাইং ফোর্টেস, মাই ডার্লিং, নূরজাহান, দিলখুস—এমন কি এ্যাটমবম্ব পর্য্যন্ত। এদের সরকার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া প্রথম ছু'ঘণ্টার জন্যে।৵০ এবং প্রতি মাঝির ॥/০ হিসাবে, দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ ঘণ্টার বেতন ৶০ হিসেবে। চার থেকে আট ঘণ্টায় মাঝি পিছু ১।৵০ হিসেবে অর্থাৎ ৪ থেকে ৮ ঘণ্টার জন্যে শীকারা ভাড়া নিলে ছু'জন মাঝির নৌকায় লাগবে ২৶০ এবং শীকারা ভাড়া ।৵০ মোট ৩৵০। শীকারায় নিসাদ, নাসিম, নাগিন বা সালিমার বাগ—এদের যে কোনটায় গেলে দিতে হবে শীকারার জন্যে ৶০ ও মাঝির জন্যে ১।৵০ হিসেবে অর্থাৎ ৩॥০। কিন্তু দাম দর কোরলে ৪।৫৲ টাকায় প্রায় সমস্ত ডাল হ্রদ চক্কর দিয়ে নিসাদ, সালিমার দেখিয়ে আনে ; পথে দূর থেকে নাসিম ও নাগিনবাগও দেখা যায়।
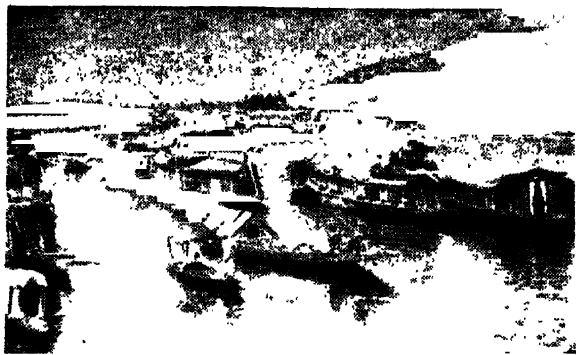
ডালদরজার কাছে (পৃঃ ৫৯)

শীকারার সারি (পৃঃ ৬০)

বিতস্তা বা ঝেলাম

(পৃঃ ৬২)

এদেশের লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে শীকারা—তার সাজসজ্জা নাই, সাধাসিধে নৌকা, তাতেই জলের এপার ওপার কোরছে হয়ত কোন ৪।৫ বছরের বাচ্চা ছেলে, দাঁড়টা তার চাইতে বড়; কেউবা একটা লোহার কি এলুমিনিয়মের থালা দিয়েই জল ঠেলছে।

একখানা শীকারা নিয়ে শ্রীনগরের পূর্ব্বধারে মুন্সীবাগের কাছ থেকে সহর দেখতে স্বুরু করা ভাল; এতে শীকারা ভ্রমণের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়, জল থেকে সহরের একটা ভিন্ন রূপ চোখে পড়ে এবং নদীর আশে পাশে প্রধান ও প্রয়োজনীয় দ্রষ্টব্যগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। আমরা অবশ্য শীকারায় ডালগেট দিয়ে মারনালা হোয়ে ঝেলাম বা বিতস্তায় পড়ে একদিন সপ্তম সেতু এবং 'ছত্তাবল' বাঁধ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, অন্যদিন ভিন্নমুখে মুন্সীবাগ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। পাঠক এবং পর্য্যটকদের স্মুবিধার জন্য মুন্সীবাগ থেকে যাত্রা কোরলে কোন্ কোন্ প্রধান দ্রষ্টব্য কোন্ দিকে পোড়বে তা মোটামুটি বোলছি :—

বিতস্তার দক্ষিণে পোড়বে এই সব জায়গা—অমর সিং ক্লাব, ষ্টেট গেষ্ট হাউস, চার্চ্চ, শ্রীনগর ক্লাব, কাশ্মীর সরকারী এম্পো-রিয়াম, ভিজিটার্স ব্যুরো, জেনারেল পোষ্ট অফিস, পোষ্ট অফিসের পেছনে বাঁধের নীচের রেসিডেন্সী রাস্তায় রেডিও ষ্টেসন, সের-ই-কাশ্মীর পার্ক (সেখ আবদুল্লার নামে), তার ওপারে পোলো খেলার মাঠের ওপারে চীনার বাগানের ধারে সাহেবী

হোটেল "নিডোজ", বাঁধের ওপর ঝেলামের তীরে গ্রিন্ডলেস্ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, এবং বাঁধের ওপরের দোকানসমূহ। তারপর আমীরা কদলের পর ডাইনে পড়ে নাগরিকদের কাঠ ও ইটের তৈরী বাসভবন, মারনালা, বসন্তবাগ, বৈদ্যুতিক কারখানা, তারপর হাব্বা কদল, বা দ্বিতীয় পুল। হাব্বা কদল থেকে ফতে কদল পর্য্যন্ত লোকজনের বাসগৃহ, ফতে কদলের পর সা-হামদান মসজিদ ও তার পাদমূলে মহাকালীর মন্দির। ফতে কদল পেরিয়ে মহারাজগঞ্জ ও দুধারে নাগরিকদের ঘরবাড়ী।

বিতস্তার বাঁদিকে পোড়বে ঃ—তীরে বাঁধা হাউসবোট শ্রেণী (সহরের সান্নিধ্যের এবং রৌদ্রের প্রাচুর্য্যের জন্য শীতের আমেজ যখন থাকে তখন এখানের নৌকাগুলি বেশী আরামপ্রদ) কনভেণ্ট কলেজ, একটা বড় মাঠ পেরিয়ে সরকারী রেশম কারখানা (বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়), লালমণ্ডির যাদুঘর এবং তৎসংলগ্ন প্রতাপসিংহ সাধারণ গ্রন্থাগার, মানমন্দির (observatory), জম্মু কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর আমীরা কদল।

আমীরা কদল পেরিয়ে 'শের-গড়' প্রাসাদ, আইন সভা, গদাধরের স্বর্ণ মন্দির। একটু ভেতরে প্রাসদের পেছনে গান্ধী পার্ক, উসমান পার্ক, সরকারী মাঠ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর। হাব্বা কদল পেরিয়ে বাঁয়ে পড়ে করণনগর, সরকারী হাঁসপাতাল, সরকারী পশম মিল। ফতে কদলের পর নূরজাহান নির্ম্মিত

সাধারণ শিশু

মানসবল তীরে

(পৃ: ৯৩)
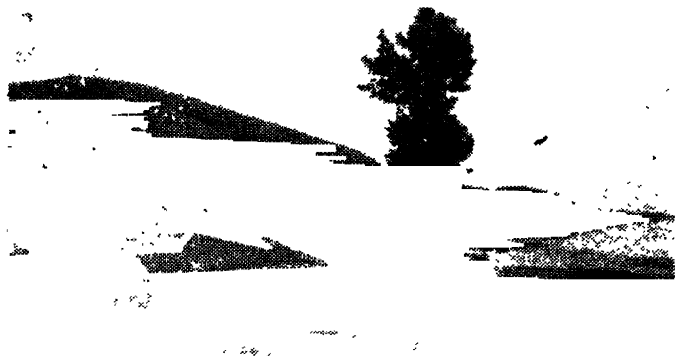
ঝেলাম তীরে 'শের-গড়' (পৃঃ ৬৩)

ডালের একটী শাখা (পৃঃ ৬৩)

'পাথর মসজিদ', তারপর নাগরিকদের বসতি। সপ্তম সেতুর পর বিতস্তার অনতিদূরে নগরের শুল্ক বিভাগের একটী দপ্তর। নগরের প্রবেশ পথে এখানে মালপত্র পরীক্ষা করা হয় ও শুল্ক আদায় করা হয়।

ঝেলাম থেকে ডাইনে 'মার নালায়' ঢুকলেও দু'ধারে বসতি মন্দির, কাঠগোলা, হাউসবোট চোখে পড়ে, তারপর ডাল দরজা পেরিয়ে সোজা গেলে শীকারা গিয়ে পড়বে ডালের গাগরী জলে বা মূল ডাল হ্রদে। ডাল দরজা পেরিয়ে বাঁয়ে বেঁকলে ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত ও গণ্ডগ্রাম রাণাওয়াড়ী পেরিয়ে ডালের অপর অংশে এসে পোড়বেন।

সহরের মধ্যে এম্পোরিয়ামটি বর্ত্তমান সরকার স্থাপন কোরেছেন দেশের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। বিদেশীরা কাশ্মীরের সমস্ত শিল্পগুলিকে একত্রে দেখতে পাবে এবং আসল জিনিষ একটা বাঁধা দরে পাবে, এই হোল এর উদ্দেশ্য। কাশ্মীরে যাত্রীদের যাওয়ার সাহায্য করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জম্মু, দেরাদুন, সিমলা, নূতন দিল্লী, কোলকাতা, অমৃতসহর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্নৌ সহরে এর শাখা খোলা হোয়েছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের ওপর বিরাট সৌধ, কিছুদিন পূর্ব্বেও যা ছিল প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রেসিডেন্টের বাসগৃহ, আজ তাই রূপান্তরিত হোয়েছে এম্পোরিয়ামে। বাড়ীটীর দরজার, ছাদের নীচের (ceiling) কাঠের কাজ দেখবার মত। প্রাঙ্গণের মধ্যেই একদিকে

কারিগরেরা কাজ কোরছে। শাল, কার্পেট, নামদা, গাব্বা, পশু লোমের পোষাক প্রভৃতি পশমী জিনিষ; বিছানার চাদর, পর্দ্দা প্রভৃতি রেশমী জিনিষ; চমৎকার কাজ করা রূপার ও তামার জিনিষ, আখরোট কাঠের আসবাবপত্র; কাগজের মণ্ড থেকে তৈরী বিচিত্র বর্ণ-শোভিত নানা ছোট বড় জিনিষ (papiar machie); উইলো গাছের তৈরী বিভিন্ন ধরণের বাক্স, সাজি প্রভৃতি কাশ্মীরের নিজস্ব শিল্প এখানে বিক্রী হয়। শালের কাপড় কিছু বিদেশ থেকে আসে বা কলে তৈরী হয়, বাকী সবই কুটীর শিল্প। কাশ্মীরী শালের খ্যাতি বহুকাল থেকে বিশ্ববিদিত। রোম, পারস্য, ফরাসী প্রভৃতি সেকালের সৌখীন দেশ কাশ্মীরী শাল ব্যবহার কোরে গর্ব্ব অনুভব কোরত। নেপোলিয়ান নীলবিজয়ের পর প্রিয়তমা জোসেফিনের জন্য যৌতুক নিয়ে যান একখানা কাশ্মীরী শাল। জৈন-উল-আবদীনের সময়েই শাল শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়; কেউ কেউ বলেন তিনিই নাকি এর প্রথম প্রবর্ত্তক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এত বেশী শাল ইউরোপে রপ্তানী হোত যে ফরাসী সরকার এখানে শাল কেনা ও পরীক্ষার জন্যে একজন কর্ম্মচারী রাখতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রপ্তানী প্রায় বন্ধ হোয়ে যায় এবং তারপর আসে বিশ্বমন্দা। সম্প্রতি ধীরে ধীরে শাল শিল্প আবার প্রসার লাভ কোরছে। ইদানীং সোনা ও রূপার জরির পাড় দিয়ে এক নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি করা হোচ্ছে।

শালের জমি ও কাজের ওপর দাম নির্ভর করে। ২০৲ টাকা থেকে ২০০০৲ টাকা বা ততোধিক দামের শাল পাওয়া যায়। কলের তৈরী জমির কাপড়কে এরা বলে র‍্যাফেল,—এগুলি সস্তা। পশমিনা তৈরী হয় তিব্বতের এক জানোয়ারের লোম থেকে। এগুলি সাধারণতঃ চরকা ও তাঁতে তৈরী, তাই নরম, গরম, হাল্কা অথচ দামী। সরকারী এম্পোরিয়ামে একখানা কার্পেট বোনা হচ্ছে দেখলাম ছত্রিশটা রং মিলিয়ে। এটী তৈরী কোরতে প্রায় ছ'মাস লাগবে, তিন চারজন কারিগর অবিরাম কাজ কোরছে। বাজারে বিক্রী কোরলে নাকি ১৫।১৬ হাজার টাকা দাম হবে। শুনলাম এটী উপহার দেওয়া হবে পণ্ডিত নেহেরুকে। এর পূর্ব্বে নাকি এতগুলি রংএর সমন্বয়ে কোন কার্পেট তৈরী হয় নাই।

প্রশস্ত পিচবাঁধান পথ পোলো মাঠের পাশ দিয়ে বিতস্তার প্রায় সমান্তরাল ভাবে গেছে—এর নাম রেসিডেন্সী রোড। এম্পোরিয়ামের প্রায় সংলগ্ন বেতার-কেন্দ্র ; তারপর শীকার দপ্তর, ভিজিটার্স ব্যুরো এবং অন্যান্য বড় বড় দোকান পাট এই রাস্তার ওপর। নদীর অপর তীরে লালমণ্ডির যাদু ঘরটী খুব বড় নয় ; এখনও বর্ত্তমান সরকারের নির্দ্দেশে এর পুনর্বিন্যাস চোলছে ; মাত্র দুটী দালান (hall) সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এরই অপরাংশে প্রতাপসিংহ সাধারণ পাঠাগার। পূর্ব্বের শেরগড় রাজপ্রসাদ অনেক পূর্ব্বেই মহারাজের আমলে আইন পরিষদ গৃহে রূপান্তরিত হোয়েছিল। বর্ত্তমান মহারাজ হরি সিং

পরীমহল ও চশমাশাহী বাগান যাবার পথে করণসিং মুরুব্বীদের ওপর পাহাড়ের কোলে ডাল হ্রদের তীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর প্রাসাদে বাস কোরতেন ; (এখন এটিও রূপান্তরিত হোচ্ছে হোটেলে। কালের কি বিচিত্র গতি !)

কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস আমরা বহু পূর্ব্বে ছেড়ে এসেছি। বর্ত্তমানের কাশ্মীরকে জানতে ও দেখতে হোলে তার ইতিহাসের ছেড়ে আসা সূত্রকে আর একবার ধরা দরকার। বিশেষ কোরে এখানের ডোগরা রাজবংশের পতন ও সেখ আবদুল্লার শাসন ভার গ্রহণ, পাকিস্তানের আক্রমণ এবং তার প্রতিরোধ ও পরিণাম—বর্ত্তমান সময়ের এই সব রাজনৈতিক গোলযোগ, যা এখন আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগের ফলে ক্রমশঃ জটিলতর রূপ নিয়েছে, এসব ভালভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাসের অনুসরণ কোরতে হবে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে।

মুসলমান সুলতানের মধ্যে জৈন-উল-আবদীন যেমন স্মরণীয় তেমনি বরণীয়। পূর্ব্ব সুলতানের হিন্দুদের ওপর ধার্য্য জিজিয়া কর তিনি তুলে দেন ও রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ কোরে দেন। রাজ্যে বহু জলসেচন প্রণালী, সেতু, পথ প্রভৃতি তিনি নির্ম্মাণ করান ; পূর্ব্বে ডাল হ্রদের জল সোজা বিতস্তায় এসে হাব্বা কদলের কাছ দিয়ে বেরিয়ে যেত। সুলতান জৈন-উল-আবদীন এই পথ বন্ধ কোরে ডাল দরজার মধ্য দিয়ে ডালের জল মারনালা দিয়ে বিতস্তায় ফেলার ব্যবস্থা করেন। এই খালের বা নালার তদানীন্তন নাম ছিল 'লচ্ছমা

কুল' (কে জানে লছমন খাল কিনা), কিন্তু জৈন-উল-আবদীনের নামে এর তৎকালীন নামকরণ হয় জৈন গঙ্গা। বিতস্তার জল নানাভাবে আয়ত্তে রেখে যাতে প্লাবন বা অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি না হয় তারও ব্যবস্থা ইনি করেন। এই স্থলতান এত জনপ্রিয় ছিলেন যে অনেক হিন্দু সে সময় তাঁকে ভগবানের অবতার বোলতেন। ইনিই কাশ্মীরে রেশম শিল্প, কাগজ শিল্প, মণ্ড-শিল্প (Papier machie) প্রবর্ত্তন করেন এবং ১৪৬৬ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরে সর্ব্ব প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। রাজকোষ থেকে নিজের জন্য কোন অর্থ তিনি নিতেন না; নিজের আবিষ্কৃত তামার খনির আয় থেকেই নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ কোরতেন। তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার তৎকালীন ইসলামী জগতে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ছিল। শেষ জীবনে ছেলেদের আচার ব্যবহারে সংসারে বীতরাগ হোয়ে তিনি একাকী পণ্ডিত শ্রীবরের কাছে 'মোক্ষ উপায় গ্রন্থ' শুনতেন এবং যোগবশিষ্ঠ পাঠ কোরতেন। ইনি অমরনাথ এবং হিন্দুদের অন্যান্য তীর্থও দর্শন কোরেছিলেন বোলে শোনা যায়। সম্রাট অশোকের পর এই স্থলতান কাশ্মীরের সাধারণ আইন-গুলি প্রজাদের জন্য পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ কোরে প্রাকাশ্য স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজও জৈন কদল বা জেনা কদল (৪র্থ পুল), জৈন পুরা, জৈনা মার্গ, জৈনাগীর, জৈনাকোট প্রভৃতি সহর ও স্থানের নামের মধ্যে দিয়ে এই শক্তিমান

মহানুভব সুলতানের নাম স্মরণীয় হোয়ে আছে। শ্রীনগরের ৪র্থ ও পঞ্চম সেতুর মাঝে জৈন-উল-আবদীন তাঁর মায়ের সমাধি সৌধ করান। আজও বাড়ীতে কোন কঠিন ব্যাধি হোলে,—বিশেষ কোরে বসন্তের আবির্ভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই সমাধির খানিকটা ভাঙ্গা ইটের টুকরো নিয়ে বাড়ীতে রাখে। এদের ধারণা এই কল্যাণময়ী নারীর আত্মা তাদের মঙ্গল কোরবেন। সুলতান জৈন-উল-আবদীনের জীবিতকালে পার্শ্ববর্ত্তী 'চকেরা' কয়েকবারই কাশ্মীর অধিকারের চেষ্টা করে কিন্তু সুলতানের শৌর্য্যে অসমর্থ হয়। এই শক্তিমান সুলতান খোরাসান, তুর্কীস্থান, শীস্থান, মিশর, তুরস্ক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে দূত বিনিময় কোরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চকেরা কাশ্মীর দখল কোরে নেয় এবং এই চক রাজবংশের শেষ রাজা ইয়াকুব খানের কাছ থেকেই ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

ইয়াকুবখানের পত্নী হাবাখাতুম তাঁর দরদী কবিতার জন্যে আজও কাশ্মীরের কবি মহলে স্মরণীয়। প্রেম ও বিরহের ঘাত প্রতিঘাতে কৃষককুলের এই সাধারণ মেয়েটীর জীবন সাংসারিক দিক দিয়ে যেমন ব্যর্থ ও করুণ, কবি প্রতিভা এবং প্রেমের পরশে তেমনি সার্থক ও পূর্ণ হোয়ে উঠেছিল। দরিদ্র কৃষক পরিবারে শ্রীনগরের ৮ মাইল্ দক্ষিণে চণ্ডহর গ্রামে অসামান্যা সুন্দরী এই স্বভাব কবি জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য মক্তবে হয় পাঠ সুরু: কিন্তু শুধু কোরাণের বয়েতে

এই শিশু কবির মন ভোরল না। তিনি পোড়ে ফেল্লেন সেখ সাদীর 'করিমা' গুলীস্থান, বোস্তান, এবং নিজেও কবিতা রচনা কোরতে লাগলেন। এই সুকণ্ঠী সুন্দরী স্বভাব-কবির প্রতিভায় প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হোলেন, কিন্তু দরিদ্র কন্যার কবি কি গায়িকা হওয়া শুধু অশোভন নয় অপরাধ। তাই বাপ মা অল্প বয়সেই মেয়ের বিবাহ দিলেন। সংসারের চাপে সঙ্গীতের উৎস যাবে শুকিয়ে এই আশাই তাঁরা কোরেছিলেন; কিন্তু কবির কাব্য কল্লোল থামলো না, সুরের নির্ঝরিণী শুকিয়ে গেল না, বরং যৌবনের জাগরণে তা পূর্ণতর প্রবলতর হোয়ে উঠলো; দয়িতের সঙ্গে মিলনের আকুল আবেগ, বিরহিণীর ব্যর্থ প্রেমের কান্না তার মধুকণ্ঠের মোহময় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মাঠে ঘাটে ঝঙ্কৃত হোতে লাগলো। যুবতী বধূর এই অসামাজিক আচরণ কোন শ্বশুর শাশুড়ী সইতে পারে? কাজেই সামাজিক, শারীরিক সব রকম শাস্তি ও শাসন সুরু হোল—গান বন্ধ কোরতেই হবে। সুরের ও সঙ্গীতের সাধনা যার সহজাত কার সাধ্য তাকে সংযত করে! বিবাহ বন্ধনের এ বাধায় সে আরও ব্যাকুল হোয়ে উঠলো, মনে মনে হোল বিদ্রোহী। অবসর পেলেই নদীতে জল আনতে গিয়ে, নয়ত বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে হাব্বাখাতুন তার অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগ উৎসারিত অবারিত কোরে দিত সুরের ঝঙ্কারে, সামাজিক সব শাসন, সব সংস্কার ও শাস্তি উপেক্ষা কোরে। এক শুভ লগ্নে 'কাঠকুড়ুনী' হাব্বার চোখোচোখি হোল দেশের সম্রাট ইয়াকুবখানের সঙ্গে। তার

সঙ্গীতে ও সৌন্দর্য্যে সম্রাট মুগ্ধ হোলেন; হাব্বা বাঈ বা জুনী (চাঁদ) ও যেন এতদিনে খুঁজে পেল তার প্রিয়তমকে। সম্রাট ৫০০০ মুদ্রা হাব্বার স্বামীকে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কোরে হাব্বাকে নিজে বিবাহ কোরলেন। ঘুঁটে কুড়োনী সত্যিই হোল রাজরাণী। রাণী হাব্বা বাঈ দেশ-বিদেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের আনিয়ে দেশে কাব্য ও স্নুরের নতুন কোরে সম্মান দিলেন এবং নিজে 'রাস্‌ল' নামে এক নূতন স্নুর সৃষ্টি কোরলেন। সহজ কথ্য ভাষায় ছোট্ট গান 'লোল সঙ্গীতে' (কতকটা ব্রজ ভাষার গানের মত) হাব্বাবাঈ গেঁথে গেছেন তাঁর বহু কথা ও ব্যথা; আজও তা কাশ্মীরী যুবক যুবতীর মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিয়ে যে জন্মেছে তার ভাগ্যে স্বামী সোহাগ রাজ-ঐশ্বর্য্য বেশীদিন সইল না। সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা ভগবানদাস ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে তাঁর স্বামীকে বন্দী কোরে নিয়ে গেলেন। বিরহিণী রাণী প্রাসাদ ত্যাগ কোরে নির্জ্জন বনকান্তারে ব্যথার রাগিনী গেয়ে গেয়ে ফিরতে লাগলেন। এই সময় গুরেজ অঞ্চলে কিষণগঙ্গা নদীর অপর পারে একটী ছোট পাহাড়ে এই স্নুকণ্ঠী রাজ-সন্ন্যাসিনী একটী কুটীরে বাস কোরতেন—আজও ঐ পাহাড়টীর নাম "হাবাবল"। তারপর জীবনের সব তিক্ততা রিক্ততা আকণ্ঠ পান কোরে তাঁর সঙ্গীতের স্নুরে স্নুরে তাদের ছন্দোবদ্ধ কোরে কাশ্মীর সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা এই কবি আবার ফিরে এলেন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে। শ্রীনগর থেকে ৫

মাইল দূরে পাণ্ড্রেথনের একটু আগে একটী ছোট গ্রাম পাণ্ডে-চকের এক পর্ণ কুটীরে প্রকৃতির এই প্রিয়কন্যা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই গ্রামে আজও তাঁর সমাধি প্রায় অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে। এই হাব্বাবাঈএর নামেই বিতস্তার দ্বিতীয় সেতুর নামকরণ হয় হাব্বাকদল।

আকবর মাত্র তিনবার কাশ্মীরে আসেন, কিন্তু তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর প্রায় প্রতি বৎসরই এই সুন্দর দেশে আসতেন এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর কোরে সাজিয়ে তোলেন বিভিন্ন উদ্যান ও প্রমোদ ভবন নির্ম্মান করিয়ে। আজ মোগল উদ্যানের মধ্যে আচ্ছাবল, নিসাদবাগ, সালিমারবাগ, চসমাসাহী ও ভেরীনাগ বর্ত্তমান, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে শুধু ডালহ্রদের তীরেই এমনি উদ্যানের সংখ্যা ছিল ৭৭৭টী। জাহাঙ্গীরের পর সাজাহানের প্রতিনিধি-শাসক (Governor) আলি মর্দ্দান পীরপঞ্জলের রাস্তায় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বহু সরাইখানা নির্ম্মাণ করান পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য। ঔরংজেব মাত্র একবার কাশ্মীরে আসেন। তারপর মোগল শক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরেও রাজপ্রতিনিধিরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হোয়ে ওঠে। শেষ মোগল সম্রাট মহম্মদসাহার (১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ অঃ) শেষ প্রতিনিধি ছিলেন আব্দুল মনসুর খাঁ। এই দুর্ব্বল শাসনের সুযোগ নিল আফগান আহম্মদ সা দুরানী। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর গেল আফগানদের হাতে। আফগান শাসকদের হাতে ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরীদের

গেছে দুর্য্যোগের ঘন রাত্রি, কারণ লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ছিল দুর্দ্ধর্ষ আফগানি শাসক সম্প্রদায়ের শাসনের নীতি। অত্যাচারিত হোয়ে এবং উৎপীড়নের ভয়ে বহু হিন্দু এ সময় দেশত্যাগ করে, মুসলমান প্রজারাও অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছিল। এই অত্যাচারিতের দলই পণ্ডিত বীরবল ধরের নেতৃত্বে মহারাজ রণজিত সিংহের শরণাপন্ন হোল কাশ্মীরের পরিত্রাণের জন্য। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিং নিজে পেছনে থেকে পুঞ্চ থেকে একদল সৈন্য দিয়ে এদের সাহায্য কোরলেন, কিন্তু সে অভিযান ব্যর্থ হোল। পরে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে রণজিতের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মিশ্রী দেওানচাঁদ এবং ডোগরা সর্দ্দার গুলাব সিং একত্রে কাশ্মীর আক্রমণ কোরে মহম্মদ আজিম খাঁকে বন্দী কোরে কাশ্মীরকে শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। শিখ সাম্রাজ্য থেকে কি ভাবে এ রাজ্য ডোগরা সর্দ্দার গুলাব সিংহের হাতে আসে তা পূর্ব্বেই বোলেছি।

এখন দেখা যাক ঘটনার কি ঘূর্ণাবর্ত্তে আবার এই হিন্দুরাজ-বংশের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা শেখ মহম্মদ আবদুল্লার হাতে চোলে গেল। মহারাজ গুলাব সিংহের পুত্র রণবীর সিংহের সময় থেকেই ইংরেজেরা কাশ্মীরকে নিজেদের মুঠোয় আনতে চেষ্টা কোরছিল—এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গিলগিট গিরিবর্ত্ম নিজেদের হাতে রাখা, কিন্তু তিনি আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ইংরেজদের আধিপত্য অস্বীকার করেন। এর ফলে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় রণবীর সিংহের নামে কুশাসনের মিথ্যা অভিযোগ

এনে সুশাসনের অছিলায় কাশ্মীরে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিয়োগ কোরতে চাইল। তিনি এতে সম্মত হন নি। কিন্তু ১৮৮৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর দেহত্যাগের পর উত্তরাধিকারী প্রতাপ সিংহকে সিংহাসন লাভের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার জানিয়ে দিলে যে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে স্যার অলিভার সেণ্ট জনকে কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হোল। বলা বাহুল্য মহারাজ প্রতাপ সিংহ স্বচ্ছন্দমনে এই নিয়োগ গ্রহণ কোরলেন না এবং পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট মিঃ প্লাউডেনের উদ্ধত ব্যবহারে তার সঙ্গে বিরোধ বেশ বেড়ে উঠলো। মিঃ প্লাউডেন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ এনে তাঁকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করেন। মহারাজ প্রতাপসিং বৃটিশের এই চক্রান্ত ব্যর্থ কোরে দিয়ে নিজেই রাজতন্ত্র বিলোপ কোরে মন্ত্রীসভা গঠন কোরে প্রজাদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কোরলেন। নিজে হোলেন মন্ত্রীসভার সভাপতি। এর চেয়ে উগ্রতর কোন শাসন সংস্কার ব্রিটিশ কোরতে পারত না, কাজেই মহারাজ প্রতাপ সিংহকে সরাবার অজুহাতটা অকেজো হোয়ে গেল। তখন প্লাউডেন সাহেব এক চুড়ান্ত চক্রান্ত কোরলেন। প্রতাপ সিংহের সহোদর অমর সিংহকে প্রলুব্ধ কোরে তার দ্বারা প্রচার করালেন যে মহারাজা প্রতাপ সিংহ প্লাউডেনকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র কোরছেন এবং কতকগুলি জাল চিঠিপত্র দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রতাপ

সিংহ এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে নিজের ভাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে ইংরাজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায় রইল না। কুটচক্রী প্লাউডেন মহারাজ প্রতাপ সিংহের কাছ থেকে ১৮৮৯ সালের মার্চ্চ মাসে সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণাপত্র সই করিয়ে নিলো। এখন আর শাসন ব্যাপারে মহারাজার কোন হাত রইল না, ইংরেজ রেসিডেন্টের নির্দ্দেশে মন্ত্রীসভা শাসন পরিচালনা কোরতে লাগলো। এই সময় একমাত্র বাঙলার অমৃতবাজার পত্রিকা বৃটিশের এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জনমতকে এ বিষয়ে জাগ্রত কোরে তোলেন। এর ফলে ভারতের ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকাতেও এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়। জনমতকে উপেক্ষা কোরে এত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ সরকারও সাহস কোরল না। তাই ১৯০৫ সালে মহারাজ প্রতাপ সিংহকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হোল।

মহারাজ প্রতাপ সিংহ দরদী দূরদর্শী শাসক ছিলেন। খাদ্য-শস্যের ওপর সমস্ত খাজনা তিনি তুলে দেন, কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত জমি তিনি জরীপ করিয়ে জমিতে প্রজাদের মালিকানসত্ব স্বীকার কোরে নেন, জমির খাজনা বহু পরিমাণে কমিয়ে দেন এবং খাজনার কতকাংশ নগদ ও বাকী শস্য দিয়ে পরিশোধের ব্যবস্থাও তিনি করেন। কাশ্মীর ও গিলগিটে 'বেগার প্রথা' তিনি

বন্ধ কোরে দেন। বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা মহারাজ প্রতাপ সিংহের আমলে প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের লুপ্তপ্রায় রেশম শিল্প এঁর চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করে। মহারাজ প্রতাপ সিংহ অপুত্রক থাকায় ১৯২২খৃঃ অব্দে তিনি যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন অমর সিংহের পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হরিসিংহকে তার প্রধান সভ্য মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ রেসিডেণ্টের শাসন আমলে বহু পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী ইংরেজী শিক্ষার স্থযোগে কাশ্মীরের উচ্চ রাজপদগুলি অধিকার কোরে বসেছিল এবং তাদের আত্মীয় স্বজনেরা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য ও সরকারী চাকরীতে প্রাধান্য পেয়েছিল। এর ফলে কাশ্মীরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল। যুবরাজ হরিসিংহও কাশ্মীরীদের বাদ দিয়ে বিদেশীদের এই আধিপত্য স্থনজরে দেখতেন না—তাই হরিসিংহের শাসন ব্যাপারে ক্ষমতা লাভে কাশ্মীরের শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎফুল্ল হোয়ে উঠলেন। কাশ্মীরে গণআন্দোলন স্থরু হয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের দ্বারা—সরকারী চাকরী লাভই ছিল তার উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালে শ্রীনগরে একটী পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়—শিক্ষিত বেকার মুসলমান যুবকেরা এখানে মিলিত হোয়ে বিদেশী এবং রাজপুতদের হাত থেকে কি ভাবে সরকারী চাকরী ছিনিয়ে নেওয়া যায় তারই আলোচনা কোরত। ইতিমধ্যে

১৯২৪ সালে মহারাজ প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়।

মহারাজ হরিসিংহ কাশ্মীরীদের দাবীর যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়ে আদেশ জারী করেন যে সমস্ত সরকারী কাজে শুধু কাশ্মীরী প্রজাকেই নিয়োগ কোরতে হবে। সরকারী বৃত্তি বা কোন আর্থিক সাহায্য শুধু কাশ্মীরী প্রজাই পাবে, কাশ্মীরী প্রজা কে তার কোন সঠিক সংজ্ঞা না থাকায় বিদেশীর দল আত্মীয় স্বজনদের কাশ্মীরে আনিয়ে কাশ্মীরী প্রজা বানিয়ে হরি সিংহের এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত আদেশকে ব্যর্থ কোরে দিতে লাগলো। ফলে হরিসিংহ কাশ্মীরী প্রজার সংজ্ঞা ধার্য্য কোরে দিলেন। মহারাজা গুলাব সিংহের সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে যারা কাশ্মীরে জন্মেছে বা বাস কোরত এবং সম্বৎ ১৯৪২ সনের পূর্ব্বে বাইরে থেকে যারা এসে কাশ্মীরেই বাস কোরছে তারাই হবে কাশ্মীরের প্রজা। এর ফলে রাজ-কর্ম্মচারীরা মনে মনে বিদ্রোহী হোয়ে উঠল এবং মহারাজার সমস্ত সদিচ্ছাপ্রণোদিত কল্যাণজনক আইন কানুনকে বানচাল কোরে দিতে লাগলো। এদিকে ১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হোয়েছে বিশ্বব্যাপী মন্দা—কাশ্মীরের জনসাধারণও এর হাত থেকে অব্যাহতি পায় নাই। আন্তরিকতাশূণ্য রাজকর্ম্মচারীদের হৃদয়হীন ব্যবহার আর্থিক অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মনে স্বতঃই অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়ে তুললো; তার সঙ্গে যোগ দিলে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সাম্প্রদায়িক প্রচার। হিন্দু ও রাজপুতেরাই শাসন ও সামরিক ব্যাপারে

প্রাধান্য পায়, অথচ তারা সংখ্যালঘু—এই হোল এখানের প্রজা আন্দোলনের গোড়ার কথা। সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া প্রাদেশিকতাও প্রবল হোয়ে উঠলো। জম্মু হিন্দু প্রধান প্রদেশ, কাশ্মীর মুসলমান প্রধান। জম্মুর অধিবাসীরা জমির মালিকানা সত্ত্বে বেশী কিছু সুবিধা ভোগ করে, মহারাজ জম্মুর অধিবাসীদের ও রাজপুতদের প্রতি বেশী অনুগ্রহ দেখান—এমনি সব নানা কারণে এই দুই প্রদেশে তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠলো। ১৯৩৪ সালে মহারাজ হরি সিংহ বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবার প্রাক্কালে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য ৪ জনের একটি ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠন কোরে যান; তার মধ্যে একজনও মুসলমান ছিল না। শিক্ষিত মুসলমানদের এটা একটা ক্ষোভের কারণ হয়।

এই সময় কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে এলেন শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এসসি পাশ কোরে শ্রীনগরে এসে তিনি পাঠচক্রে যোগ দেন এবং ১৯৩১ সাল যে ব্যাপক গণ আন্দোলন সুরু হয় তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের বুকে তখন যে আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগের আবহাওয়া চোলছিল তারই আলোড়ন এখানের রাজনৈতিক জড়জীবনেও স্পন্দন আনলো। এই আন্দোলনের ফলে শ্রীনগরে সেণ্ট্রাল জেল আক্রমণের সময় পুলিসের গুলীতে যে ২১ জন হত হয় সে কথা পূর্ব্বে বোলেছি। এই

সময় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শেখ আবদুল্লাকেও আইন অমান্যের জন্যে জুম্মা মসজিদে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গোড়ে ওঠে—"জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স।" এই সময় পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের প্রবল প্রাধান্য—সেখানের ঝাঁজ এসে এই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে মুসলমানী প্রজাদের বেশ উত্তপ্ত কোরে তুলছিল।

মহারাজ হরিসিংহ ইওরোপে বাল্যকাল থেকে মানুষ; তিনি দূরদর্শী এবং প্রগতিবাদী। ১৯৩৪ সালে ৭৫ জন সদস্য নিয়ে এক শাসন পরিষদ স্থাপনের ঘোষণা কোরলেন, তার নাম হোল "প্রজা সভা।" এর মধ্যে ৩৩ জন হোল প্রজাদের নির্ব্বাচিত সদস্য, কিন্তু ১৯৩৬ সালের মে মাসে মুসলীম কনফারেন্স সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাচিত শাসনপরিষদ দাবী কোরে আন্দোলন সুরু করে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে মহারাজার কোন ক্ষমতা থাকবে না, প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা সে ক্ষমতা লাভ কোরবেন—এই হোল দাবী। আজ পণ্ডিত নেহেরু শেখ আবদুল্লাকে যতই জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক বোলে বিজ্ঞাপিত করুন, ভবিষ্যতের ইতিহাস একথা বোলবেই যে শেখ আবদুল্লা মহারাজ হরি সিংহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু করেন তা ইংরেজের ইঙ্গিতে চালিত পাঞ্জাবের মুসলীম লীগের অনুপ্রেরণায়। ('ভারতবর্ষে' এই অংশ প্রকাশিত হইবার পর ইতিমধ্যেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।)

মহারাজ হরিসিংহ দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করেন এবং ইংরেজকে কাশ্মীরের উত্তরের গিলগিট গিরিবর্ত্মে মাথা গলাতে দেন নি। (ভারতে মন্ত্রী-মিশনের কাছেও মহারাজ এ দাবী পুনরায় জানান।) এর ফলে ইংরেজ তাঁকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল এবং তার অস্ত্র হিসেবে আবদুল্লাকে ব্যবহার কোরেছিল। শেষে ১৯৩৪সালে মহারাজা ৬০ বৎসরের জন্যে বৃটিশ সরকারকে গিলগিট ইজারা দিতে বাধ্য হন; এর ফলে তাদের কাছে আবদুল্লার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কাজেই এর পর আবদুল্লা মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দ্যের কথা প্রচার কোরতে আরম্ভ করেন। তিনি চেয়েছিলেন অর্থ নৈতিক ভিত্তির ওপর আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা কোরতে—যাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একসঙ্গে মিলে হিন্দু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা যায়। এই আন্দোলন জম্মুর চেয়ে মুসলমানগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকাতে বেশী বেগবান হোয়ে ওঠে। এই 'মুসলীম কনফারেন্স' রাজনৈতিক দলে এতদিন হিন্দুদের সভ্য হওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৩৮ সালের ২৮শে জুন শ্রীনগরে ৫২ ঘণ্টা প্রচণ্ড বিতণ্ডার পর শেখ আবদুল্লা এক প্রস্তাব পাশ করিতে সমর্থ হন—যাতে বলা হয় সকল ধর্ম্মের লোকই মুসলিম কনফারেন্সের সভ্য হতে পারবে। মুসলমানগণ যেখানে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে এই প্রস্তাব এতদিন পরে কেন গ্রহণ করা হোল এইটাই আশ্চর্য্য। ১৯৩৮ সালে শেখ আবদুল্লা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন, সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব তার ফল। ১৯৩৯ সালের ১১ই জুন ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের প্রভাবে "মুসলীম কনফারেন্সের" নাম পরিবর্ত্তন কোরে নূতন নামকরণ হয় "নাশন্যাল কনফারেন্স"। ১৯৪২ সালে ভারতের বুকে জ্বোলল বিপ্লবের বহ্নি। আইন না মানা; বাঁধন ভাঙ্গার সে কল্লোল কিছু কিছু কাশ্মীরেও পৌঁছল। ১৯৪৪ সালে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স ঘোষণা কোরলে—পরিপূর্ণ সাম্যবাদ তাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের অন্যতম নায়ক মিঃ জিন্না মুসলমানগরিষ্ঠ এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি জ্বালাবার সুযোগ হারালেন না। তিনি কাশ্মীরে গিয়ে শেখ আবদুল্লাবিরোধী মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম কনফারেন্সের সভায় তার স্বভাব সিদ্ধ বিষবাষ্প প্রয়োগ করেন। তিনি বোল্লেন "মুসলমানদের যেমন এক আল্লা ও এক কলমা, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠান হওয়াই যুক্তিসম্মত"। তিনি ভারতীয় কংগ্রেস প্রভাবিত মহম্মদ আবদুল্লাকে হীন ভাষায় আক্রমণ কোরে তাকে গুণ্ডার সর্দ্দার বোলে গালাগাল দেন। শেখ সাহেব তখন কাশ্মীরের ত্রাণকর্ত্তা, একমাত্র নেতা হিসেবে পূজিত। কাজেই এর ফলে জনসাধারণ জিন্না সাহেবের ওপর এমন ক্ষেপে ওঠে যে তিনি তাড়াতাড়ি কাশ্মীর ত্যাগ কোরতে বাধ্য হন। তাঁর নিরাপদে পলায়নের

সাহায্য কোরতে সঙ্গে গিয়েছিলেন মকবুল শেরওয়ানী, যাঁকে পরে জিন্নারই সৃষ্ট পাকিস্থানী দল বারামুল্লায় ১৪টি গুলীর আঘাতে হত্যা করে।

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে "শোপুরে" ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের এক অধিবেশন হয়—এতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ, খান আব্দুল গফুর খান প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এই সঙ্গে ভারতের দেশীয় প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীরও অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন কাশ্মীরে সত্যকার গণ আন্দোলনের বীজ বপন করে, কারণ এই সম্মেলন জনসাধারণের মনে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। ভারতে যখন ক্যাবিনেট মিশন আসে (১৯৪৬ সালের মে মাসে) তখন ন্যাশন্যাল কনফারেন্স এক স্মারকলিপিতে ডোগরা রাজবংশের হাত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে ও "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ করে। ডোগরা শাসনযন্ত্রকে অচল কোরে দেবার আন্দোলনের ফলে ১৯৪৬ সালের ২১শে মে কাশ্মীরে সামরিক আইন জারী করা হয় এবং জহরলালজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভারতমুখী শেখ আবদুল্লাকে পথেই গারহিতে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে গণ আন্দোলন আরও ব্যাপক হোয়ে পোড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে শাসকের রোষও উগ্রতর হোলো। সামরিক বাহিনীকে আন্দোলন দমনের জন্য ঢালাও হুকুম দেওয়া হোয়েছিল, কাজেই বহু ক্ষেত্রেই অমানুষিক ও অন্যায় অত্যাচার হোয়েছিল। ওরা জুন শেখ

আবদুল্লার বিচারের দিন ধার্য্য হয়, পণ্ডিত জহরলাল তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য জুন মাসে শ্রীনগর যাত্রা করেন। জহরলালজীর মত প্রভাবশালী ভারতীয় নেতার আগমনে রাজনৈতিক আন্দোলন আরো প্রবলতর হবে এই আশঙ্কায় কাশ্মীর সরকার তাঁকে কাশ্মীরে ঢুকতে নিষেধ করেন। তিনি এ আদেশ অমান্য করায় ১৯৪৬ সালের ২০শে জুন বেলা ৯৷৷০টায় শ্রীনগর থেকে ১০০ মাইল দূরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আজাদের আদেশে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন বলায় কয়েকদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিচারে শেখ আবদুল্লার ৫০০৲ জরিমানা এবং ৯ বৎসর কারাবাসের আদেশ হোল।

এর মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। ১৯৪৭ সালে মহাত্মাজী প্রথম কাশ্মীর গেলেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীকাকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজার সঙ্গে দেখা কোরে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সঙ্গে আপোষ কোরতে মহারাজাকে অনুরোধ করেন। স্বাধীন ভারতে মহাত্মাজীর অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর, কাজেই তা না মেনে মহারাজার উপায় ছিল না। এর ফলে প্রধান মন্ত্রী শ্রীকাক ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট পদত্যাগ কোরলেন; শেখ আবদুল্লাও ২৯শে সেপ্টেম্বর মুক্তি পেলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্থান বিভক্ত হোয়েছে। উভয় রাষ্ট্রই চায় কাশ্মীর তার দিকে যোগ দিক। কাশ্মীর-মহারাজা ভেবেছিলেন এই সুযোগে তিনি নিরপেক্ষ

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত কোরবেন। শ্রীকাকের স্থলে মহারাজা পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীমেহের চাঁদ মহাজনকে ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। এই পাঞ্জাবী হিন্দুর নিয়োগকে শেখ আবদুল্লা তথা তাঁর ন্যাশানাল কনফারেন্স ভাল চোখে দেখেন নি।

ভারত বিভাগের পর মহারাজা পাকিস্থানের সঙ্গে একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি করেন। ইংরেজ আমলে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারত সরকারের যে সকল সম্বন্ধ ও সর্ত্ত ছিল তাকেই মেনে উভয় পক্ষ চোলবেন স্থির হয়। পাকিস্থানের জনক জনাব জিন্না প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য তাঁর পাকিস্থানের অন্তর্গত হবে, কিন্তু তাঁর এ সাধে বাদ সাধলেন জাতীয়তাবাদী শ্রীনেহেরুর বন্ধু শেখ আবদুল্লা। তিনি খোলাখুলিভাবে মিঃ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের নিন্দা কোরে ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আদর্শে আস্থা জানালেন। শেখ সাহেবের দেশ-প্রেম এবং নির্ভীকতায় অধিকাংশ কাশ্মীরবাসী তাঁকেই সমর্থন জানাল। মিঃ জিন্না "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন সমর্থন করেন নাই—একে গুণ্ডামী বোলে অভিহিত করেন এবং কাশ্মীর কোনদিকে যোগ দেবে তা স্থির কোরবেন মহারাজা, কাশ্মীরবাসী নয়; এই মত প্রকাশ করেন। তিনি সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন মহারাজাকে চাপ দিয়ে পাকিস্থানে যোগ দিতে রাজী করান সহজ হবে—কিন্তু মুসলিম লীগের বিরোধী দলের নেতা

আবতুল্লা সাহেবকে দলে আনা কঠিন হবে। আদর্শের ঝগড়া ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে জিন্না সাহেবের সঙ্গে আবতুল্লা সাহেবের ইতিপূর্বে মনোমালিন্য ঘোটেছিল, আর এদিকে শ্রীনেহেরুর সঙ্গে আবতুল্লা সাহেবের সৌহার্দ্যের বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হোয়ে উঠছিল। তাই কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা পাকিস্থানের প্রয়োজন হোল। শ্রীনগর থেকে দূরে আবতুল্লা সাহেবের সাক্ষাৎ প্রভাবের গণ্ডীর বাইরে পুঞ্চ এলাকায় মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে হিন্দুনিধন যজ্ঞ আরম্ভ হোল। পাকিস্থান পেছন থেকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজেদের সৈন্যদের ছুটি দিয়ে উপজাতিদের সাহায্য কোরতে পাঠিয়ে দিলো। নিরস্ত্র অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা কোরে, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন কোরে, নারীধর্ষণ কোরে, অগ্নিদাহের বিভীষিকা সৃষ্টি কোরে হিন্দু রাজার শাসন ব্যবস্থা অচল কোরে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

মহারাজের মুষ্টিমেয় সৈন্য উপজাতিদের এবং পাকিস্থানের সাহায্যে প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত প্রজাদের সহজে আয়ত্বে আনতে পারলো না—ক্রমে এই উন্মাদনা, লুঠের লোভ, নারীর মোহ, ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পোড়ল। মহারাজের অনেক মুসললান সৈন্যও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। শাসন ভাঙ্গার নেশা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পোড়ল—এমন কি শ্রীনগরেও সমস্ত পোষ্ট অফিস ও সরকারী অনেক অফিসে পাকিস্থানী পতাকা উড়তে লাগলো।

এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান কাশ্মীরের সব ক'টী বাইরের রাস্তা অবরোধ কোরে দিল। এর ফলে চিনি, নুন, কাপড়, পেট্রল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ থেকেই শুধু কাশ্মীর বঞ্চিত হোল না, তার আমদানী শুল্ক বাবদ রাজস্ব দৈনিক ৩০ হাজার টাকা থেকে মাত্র কয়েক শত টাকায় নেমে এল। বলা বাহুল্য এই অবরোধ স্থিতাবস্থা-চুক্তি ভঙ্গ কোরেই করা হোয়েছিল। এর সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর দলবদ্ধভাবে উপজাতি দস্যু সামরিক কায়দায় আধুনিক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হোয়ে হাজারে হাজারে মুজফরবাদে আক্রমণ সুরু করে এবং ২৪শে অক্টোবর দখল কোরে লুঠ, অগ্নিদাহ ও নারী-ধর্ষণের নারকীয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করে। সাফল্যের অভিযানে উন্মত্ত হোয়ে পঙ্গপালের মত এই নরপশুর দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও ২৬শে অক্টোবর বারামুল্লা সহর দখল করে নেয়। বারামুল্লা সহরের সমস্ত যুবতী নারীকে ক্যাম্পে আটকে রেখে এই বর্ব্বরের দল তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। বলা বাহুল্য এই অত্যাচার বা লুণ্ঠনে তারা এত উন্মত্ত হয় যে হিন্দু মুসলমান বাছবার অবসরও তাদের ছিল না। মহারাজার সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংহ যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে এদের বাধা দেন, কিন্তু তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য এই পঙ্গপালদলকে বাধা দিতে পারে নাই। পশুর মত এই হানাদারের দল বারামুল্লা থেকে ক্রমে শোপুর, হান্দওয়ারা, গুলমার্গ এবং বেদগামের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই আক্রমণ এমন অতর্কিত, দ্রুত ও সুপরিকল্পিত যে এতবড় নৃশংস আক্রমণের কাহিনী ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর লোক জানতে পারলো ২৬শে অক্টোবর অর্থাৎ ৪।৫ দিন পর। পাকিস্থানের পরিকল্পিত প্রচণ্ড এই আঘাতে মহারাজা, শেখ আবদুল্লা তথা কাশ্মীরবাসী বুঝতে পারলো যে আজকের জগতে কাশ্মীরের মত ছোট দুর্ব্বল রাজ্যের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতার স্বপ্ন কত অলীক। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমহাজন এবং শেখ আবদুল্লা ছুটে এলেন নূতন দিল্লীতে ২৬শে অক্টোবর। কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত কোরে নিয়ে তাকে সৈন্য ও সামরিক সাহায্য দিয়ে রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। মহারাজা শাসনভার সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কোরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত একটি অন্তবর্ত্তীকালীন সরকার গঠন কোরবেন এবং পরে কাশ্মীরের জনসাধারণ নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কোরে শাসন পরিষদ গঠন কোরবে এবং নিজেদের পছন্দমত ভবিষ্যতে ভারত বা পাকিস্থানে যোগ দেবে এই সর্ত্তে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোরে ২৭শে অক্টোবর ভারত সরকার বিমান বাহিনী ও সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। ৩০শে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে শেখ আবদুল্লা অন্তবর্ত্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষিত হন। শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩০।৩৫ মাইল দূরে তখন পাকিস্থানী পরিচালিত আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতিরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে উন্মত্ত। শেখ আবদুল্লার শাসন ক্ষমতা লাভের এবং ভারতীয় বিমান-

বাহিনীর সৈন্যদের আগমনে মুহ্যমান কাশ্মীরী জনতা নবপ্রেরণা লাভ কোরল। শ্রীনগরে তখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পোড়েছিল—ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক দল সহরের পুলিশ বিভাগের কাজের ভার নিল। এদিকে মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্য যারা প্রথম বিমানে এসে পৌঁছিল, লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রায়ের অধিনায়কত্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হোয়ে তারা অসীম শৌর্য্য ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে প্রায় সকলেই নিজেদের প্রাণ বলি দিল, কিন্তু এতে হানাদারদের অগ্রগতি রুদ্ধ হোল। কাশ্মীরে এই যুদ্ধে ভারতীয় অধিনায়ক ও সেনানীদের অদ্ভুত আত্মত্যাগের এমনি বহু ঘটনা আছে যা ইতিহাসের অনেক মহান দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শকেও ম্লান কোরে দিতে পারে। সুযোগ হোলে এদের বীর্য্যগাথার কিছু কিছু পরে বোলব।

২৬শে অক্টোবর কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোল, সেইদিনই মাত্র বিমানবাহিনীর মাধ্যমে সামরিক সাহায্য প্রেরিত হোল। স্থলপথে যোগাযোগের সব রাস্তাগুলিই তখন পাকিস্থানের কবলে; কাজেই পাঠানকোঠ থেকে নূতন রাস্তা বিদ্যুৎগতিতে নির্ম্মিত হোতে সুরু হোল। ৮ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী বারামুল্লা পুনরুদ্ধার কোরে নেয়; শোপুর আগেই অধিকৃত হয়। ১১ই নভেম্বর দূরবর্ত্তী উরি থেকেও শত্রুসৈন্য বিতাড়িত হয়। ঐ তারিখেই প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু শ্রীনগরে উপস্থিত হন। কাশ্মীর করায়ত্ত হোয়েও হঠাৎ এই ভাবে

হস্তচ্যুত হওয়ায় জিন্না সাহেব বিষম খাপ্পা হোয়ে উঠলেন। যেদিনই লাহোরে খবর পৌঁছল যে বারামুল্লা হাতের বাইরে চোলে গেছে, সেইদিনই মধ্যরাত্রে গভর্ণর জেনারেল জিন্না সাহেব পরামর্শদাতাদের এক সভা আহ্বান করেন এবং পাকিস্থান বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল গ্র্যাসিকে অবিলম্বে সামরিক বাহিনী নিয়ে বারামুল্লা দখল করার হুকুম দেন। বারামুল্লা, শ্রীনগরের বিমান ঘাঁটী এবং বার্নিহাল গিরিবর্ত্ম দখল কোরতে পারলেই ভারতের পক্ষে কাশ্মীরকে কোন সাহায্য করা অসম্ভব। জেনারেল গ্র্যাসির জিন্না সাহেবের মত অত উত্তেজনার কারণ ছিল না, তিনি বোলে পাঠান কাশ্মীর এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই সেখানে সামরিক বাহিনীর সরকারী আক্রমণের অর্থ ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ—সেটা কতদূর সমীচীন হবে জিন্না সাহেব যেন ভেবে দেখেন। এর ফলে সরকারী সামরিক বাহিনী আর পাঠান হোল না, কিন্তু সৈন্যদের ছুটি দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সমেত ছেড়ে দেওয়া হোল উপজাতিদের সাহায্যের জন্যে এবং সংবাদ পত্রে, রেডিওতে অবিরাম কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা হোতে লাগলো, দুখানা বিমানও আক্রমণকারীদের হাতে বেসরকারী ভাবে দেওয়া হয়। সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকার সমতলভূমি শত্রু-সৈন্য শূন্য হওয়ার পর ভারত সরকার পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ এনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিশ

জানালেন। সেখানে আজ ৬ বছরের ওপর এ নিয়ে নানা টালবাহানা চোলেছে—তা সংবাদ-পত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন। ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ্চ মহারাজা হরিসিংহ একটী ঘোষণায় শেখ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রীত্বে বরণ কোরে রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনার ভার তাঁকেই দেন। অতঃপর আবদুল্লা সরকারের এবং ভারত সরকারের চাপে মহারাজাকে ১৯৪৯ সালের ২০শে জুন তাঁর পুত্র যুবরাজ করণসিংকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ কোরে রাজ্য থেকে সরে আসতে হয়।

কাশ্মীরের অন্তবর্ত্তী সরকার কাশ্মীরের একটি পৃথক শাসনতন্ত্র রচনা কোরে, মহারাজার সমস্ত শক্তি লোপ কোরে, নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যুবরাজ করণসিংহকে পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত কোরলেন। তাঁর উপাধি হোল সর্দ্দার-ই-রিয়াসৎ। শেখ আবদুল্লা প্রধান মন্ত্রী হিসাবে সত্যকার শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেন। সেদিনের রাজদ্রোহী আজ ভাগ্যচক্রে হোয়ে উঠলেন রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক—শের-ই-কাশ্মীর। কিন্তু ৮ই আগষ্টের রাত্রে (১৯৫৩) আবার কালের চক্র ঘটাল শেখ আবদুল্লার ভাগ্যবিপর্য্যয়—বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অপরাধে অতর্কিতে সে হলো বন্দী।

ইতিহাসের একটানা অনুসরণে আপনারা অনেকে হয়ত হাঁপিয়ে উঠেছেন; কাজেই এখন এখানেই ইতিহাসের ইতি করি।

শ্রীনগরের ভিজিটার্স ব্যুরো মোটর বাসের ব্যবস্থা কোরেছে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান দেখবার জন্যে। কোন কোন জায়গায় রোজই বাস যায় ; কোথাও বা সপ্তাহে দু' তিনবার। ভিজিটার্স ব্যুরোতে এই সব যাত্রার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আবার তারই কতকগুলি ট্রানসপোর্ট কণ্ট্রোলারের অফিস দাম নিয়ে বিক্রী করে। এই সব পুস্তিকা পূর্ব্বে সংগ্রহ কোরে নেওয়া ভাল। আমরা সরকারী বাস যে সব জায়গায় যায় তার সবগুলিতেই গিয়েছিলাম।

উলার হ্রদ এলাকা :—

এক এক দিনের যাত্রার কথা এবার বলি :—

উলার হ্রদ এলাকা :—সকাল বেলা ট্রান্সপোর্ট কণ্ট্রোলারের অফিস থেকে (নিডোজ হোটেলের কাছে, হোটেল রোডে) সকাল ৮ টায় বাস ছাড়ার কথা ছিল, ছাড়লো ১০টায়। বাসের আড্ডায় প্রথমেই চোখে পোড়ল একটি পরিচিত মুখ—পণ্ডিত প্রবর ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সপরিবারে তিনিও এসেছেন এখানে বেড়াতে। বাসের আড্ডায় ও পরে বাসে কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল কোট প্যাণ্টধারী যাত্রীদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান মাথায় কাশ্মীরী পশমের মুসলমানী টুপি, গলাবন্ধ লম্বা কোট আর পায়জামা পরণে—দেখে নিশ্চিত ধারণা করেছিলাম কোন পাঞ্জাবী মুসলমান ; কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তান। বাঙ্গালী মেয়েদের শাড়ী পরার

বলন ধরণটা সহজেই তাঁদের চিনিয়ে দেয়; কিন্তু আধুনিকা বাঙালী মেয়েদের বিভিন্ন ফ্যাসানের শাড়ী পরার কৌশল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তারা বাঙালী কি পার্শী, গুজরাটী, মারাঠি বা উত্তর প্রদেশীয় পোষাক থেকে চেনা মুস্কিল। আরও অতি আধুনিকাদের গ্যারারা সালোয়ার কামিজ ও ওড়না বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য শালীনতাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়। বাংলার বাইরে কথাবার্ত্তাও প্রায় সুরু হয় ইংরাজীতে, কাজেই কোথায় বাড়ী এই প্রশ্ন না কোরলে বেশ দেখে বাসস্থান ধরা কঠিন।

শ্রীনগরে এবার (১৯৫২ সালে) এত বেশী বাঙ্গালীর ভীড় হয়েছিল যে, যে কোন বিদেশীকে প্রথমেই বাংলায় ভরসা কোরে কথা বলা চলে; শতকরা বিশ পঁচিশ জন ফস্কে যেতে পারে, কিন্তু ৭৫ জন ঠিকই বাঙ্গালী। এই সুদূর বিদেশে বাঙালীর বাহুল্য বিস্ময়কর বটে।

বাস ডালগেট হোয়ে বিতস্তার দক্ষিণ তীরে শহরের ভেতর দিয়ে এসে মাঠের মধ্যে পোড়ল। রাস্তা পাকা কিন্তু পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা তার মতো অত ভালো নয়। শহর থেকে ৩।৪ মাইল এসে বাঁয়ে চোখে পোড়ল আনচার হ্রদের জল। এটি একটি ছোট অগভীর হ্রদ—নানা গাছপালা ও আবর্জ্জনায় আবদ্ধ। ডালের জলের সঙ্গেও এর যোগ আছে, কাজেই শীকারায় আসা যায়; এর পূর্ব্ব তীরে বিচার নাগ নামে একটী হিন্দু তীর্থ আছে।

প্রায় ১৪ মাইল পর এলো গন্ধর্বল (হয়ত পূর্ব্বে

ছিল গন্ধর্ব্ববল) গন্ধর্বল সিন্ধু নদীর তীরে একটি ছোট গ্রাম,—পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে এবং ছোট একটি ডাক্তারখানা আছে। গ্রীষ্মে এখানে হাজার হাজার স্বাস্থ্যান্বেষী এবং বিলাসীর ভীড় হয়। সিন্দু নদীর বুকে বা তার নানা শাখা প্রশাখায় তখন বহু নৌগৃহের নোঙ্গর পড়ে। সিন্ধুর তীরের সবুজ সমতল শীতল চীনারের ঘন-ছায়ার তলে পড়ে বিভিন্ন তাঁবুর শ্রেণী, কেউ কেউ বা আশ্রয় নেন এখানের গ্রাম্য পর্ণ কুটীরে। সিন্ধুর শীতল জল এবং এখানের নির্জ্জনতা অথচ শ্রীনগরের সান্নিধ্য একে বিদেশী বিলাসীদের কাছে বেশী প্রিয় কোরেছে। বোলে রাখা ভালো সিন্ধুর জলে এখানে এত বেশী চূর্ণ যে তা পানীয় হিসাবে অব্যবহার্য্য। তাই তীরের ঝরণা থেকে পানীয় জল আনতে হয়। সিন্ধুর শীতল জলে স্নান গ্রীষ্মে এখানের অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীনগরের হোটেলে একজনের সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল—তিনি সপরিবারে শ্রীনগর থেকে বড় হাউস বোটে এখানে জলপথে এসেছিলেন, তিনি এখানকার অবস্থার প্রশংসা কোরলেন না। মানসবল ছাড়া উলার বা অন্য কোন জল-পথের তিনি সুখ্যাতি করেন নি—বোল্লেন আবর্জ্জনা ও পোকায় ভর্ত্তি; তাঁর মতে এ সময় জলপথে এসব জায়গা যাওয়া সময় ও অর্থের অপব্যয় মাত্র। ১৯৩০ সালে আমি শ্রীনগর থেকে জলপথে উলার আসি এবং বন্দীপুরা

ও সোপুর হোয়ে স্থলপথে সারদাতীর্থে যাই—সেটা সম্ভব শ্রাবণ মাস, তখন কিন্তু এ পথ ভারী উপভোগ্য ছিল। শীতের দিনে হ্রদগুলি এবং জলপথ অনেকখানি শুকিয়ে যায়, কাজেই সৌন্দর্য্যও যায় ম্লান হোয়ে।

গন্ধর্বল থেকে ৩ মাইল এসে ক্ষীর-ভবানী তীর্থে বাস থামলো। কাশ্মীরে হিন্দুদের এটা একটা প্রধান তীর্থ। বিশেষ কোরে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কিছুদিন বাস করায় ও এখানের সঙ্গে তাঁর জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা জড়িত থাকায় বাঙ্গালীদের কাছে ক্ষীর-ভবানীর আকর্ষণ যেন অধিকতর। নৌকা পথেও ক্ষীর-ভবানী আসা যায়।

তুলামুল্লা গ্রামের একাংশে ক্ষীর-ভবানীর মন্দির—বেশ শান্ত পরিবেশ। চারিদিকে খালের মধ্যে প্রায় চতুষ্কোণ একটি দ্বীপ—তার ওপর দেবীর কুণ্ড, মন্দির ও ভোগগৃহাদি। পাথর বাঁধান চত্বরের একদিকে একটি জলকুণ্ড—তার মাঝখানে ছোট মর্ম্মর মন্দির—তীর থেকে মন্দিরে যাওয়া যায় না, তাই পূজার নৈবেদ্য বা অর্ঘ্য কুণ্ডের জলেই ফেলতে হয়। এখানে ঐ জলই দেবীর মূর্ত্তি, অন্য কোন মূর্ত্তি নাই, দেবীর অন্য নাম রাগনিয়া। এ জায়গাটি বেশ প্রাচীন—সংস্কৃত রুদ্রমালা তন্ত্রে এর উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনীতে পণ্ডিত কলহন ক্ষীর-ভবানী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ কোরেছেন। অত্যাচারী রাজা জয়াপীড় (৭৫৬-৭৮৪ খৃঃ) অন্যান্য হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সঙ্গে যখন তুলামুল্লার পূজারী ইটিলার

জাহাঙ্গীর যাকেয়াও কোরলেন তখন একদিন তাঁর রাজছত্রের একটি স্বর্ণদণ্ড হঠাৎ পোড়ল তাঁর ওপর এবং সেই আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। মুসলমান আমলে অবহেলিত হোয়ে এ তীর্থ প্রায় লুপ্ত হোয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার কৃষ্ণ পণ্ডিত টাপলু নামে এক ভক্ত এ লুপ্ত তীর্থকে আবিষ্কার কোরে হিন্দু সমাজে প্রচার করেন।

মায়ের কুণ্ডটী থেকে অবিরাম জলধারা উৎসারিত হোয়ে বাইরের নালায় গিয়ে পোড়েছে। ক্ষীর অর্থাৎ পায়স এখানের প্রধান নৈবেদ্য—তাই এই জলমূর্ত্তি শাক্ত-দেবীর নাম ক্ষীরভবানী।

কথিত আছে—ইনি লঙ্কার রাবণের পূজিতা দেবী ছিলেন। হনুমান একে লঙ্কা থেকে এনে এখানে স্থাপন করেন। দীর্ঘ দিন ধোরে কুণ্ডের জলে পূজার ফুল, নৈবেদ্য জোমে জোমে কুণ্ডটির জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। মহারাজা প্রতাপসিংহ কুণ্ডটীর সংস্কার করেন। সে সময়ে ময়লার নীচে আবিষ্কৃত হয় একটী পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি; নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য কারুকার্য্যশোভিত বড় বড় কয়েক খানা পাথরও পাওয়া যায়। মহারাজা প্রতাপসিংহ সেই মন্দিরের ভিত্তির ওপর বর্ত্তমান মর্ম্মর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান (১৮৮৫-১৯২৫ খৃঃ অঃ)। এই মন্দিরে অনেক শাক্ত ও বৈষ্ণব কয়েকটী দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন জায়গা কোরে নিয়েছেন।

এই জল-তীর্থের বৈশিষ্ট্য এই কুণ্ডের জলের পরিবর্তনশীল রং। কখনও জলের রং লাল হয়; কখনও বেগুনী, কখনও সবুজ, কখনও বা কালো। দেশে মড়ক বা হত্যাকাণ্ড ঘোটবে আশঙ্কা থাকলে এখানের জল ঘন লাল হোয়ে যায়; সবুজ শান্তির পরিচায়ক, কালো সাংঘাতিক জাতীয় বিপদের সূচনা করে। কাশ্মীরে 'কাবালী' (আফ্রীদীদের এরা কাবালী বলে) আক্রমণের সময় এখানের জলের রং সত্যিই পরিবর্তিত হোয়েছিল কিনা অনেককে জিজ্ঞাসা কোরলাম। সকলেই একবাক্যে বোল্লেন—জল কালো হোয়ে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ ছ'মাস ধোরে তা কালোই ছিল। এখন অবশ্য জলের রং ফিকে সবুজ বোধ হোল। তুলামুল্লা গ্রামের কয়েক মাইলের মধ্যে পাকিস্থানী হামলা যখন এগিয়ে এসেছিল, নারী ও শিশুদের প্রায় সকলেই শ্রীনগরে পালিয়ে গিয়েছিল; কেউ কেউ সপরিবারে স্থান ত্যাগ করেন। সে সময় শ্রীনগর পর্য্যন্ত টাঙ্গা ভাড়া ৭৫।১০০৲ টাকা উঠেছিল। জাপানের খেলনা বোমার চোটে কোলকাতার লোকদের পালানর হিড়িক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সত্যিকার আক্রমণের মুখে প্রাণ ভয়ে পলায়নের চড়া মূল্য সহজেই বুঝতে পারবেন। তুলামুল্লার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান—সামান্য কয়েক ঘর মন্দিরের পূজারী—পণ্ডিত। [illegible] আক্রমণের সময় মুসলমানদের অধিকাংশই এঁদের আগু বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ কোরেছে এবং হিন্দুদের যথেষ্ট অত্যাচারের ভয় দেখিয়েছে শুনলাম। একদিন

পরই গ্রামটী পাকিস্থানের কবলে যাবে এমনি যখন অবস্থা, তখন সহসা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মোটর ও বিমানের গর্জ্জনে পাকিস্থানের পঙ্গপাল থমকালো ; মুমূর্ষু হিন্দুর দল চমকালো। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে তারা কি সত্যই রেহাই পেলো? রেহাই তারা পেলো—কুণ্ডের যে জল ছ'মাস ধোরে কালো ছিল, তা ধীরে ধীরে আবার সবুজ হোতে স্থরু কোরেছে। কুণ্ডের তীরে একটী আচ্ছাদিত আশ্রয় আছে—তার ভেতর যাত্রীরা বোসে কুণ্ডে পূজা দেয়। মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রায় কুড়িটী দোকান। পাঁচ আনা থেকে পাঁচ টাকা—দক্ষিণা উপযোগী পূজার ডালি এখানে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা লোভী নয়, যার খুসী পূজা কোরবেন—এজন্য পীড়াপীড়ি নাই, পরকালের ভয় দেখান নাই। প্রায় সকল যাত্রীই পূজা কোরলেন, প্রাঙ্গণের একদিকে এক প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে হোম হচ্ছিল, কেউ হয়ত কোন মানসিক পূরণের জন্যে এ হোম কোরছিলেন। কঠিন পুরাতন রোগীরা এখানে এসে মায়ের স্মরণ নেন—দেবী মাহাত্ম্যে বা স্থানীয় আবহাওয়ার মাহাত্ম্যে এঁরা অধিকাংশই ফল পান শুনলাম। প্রতি অষ্টমী তিথি দেবী পূজার বিশেষ বার ; কালীঘাটের কালী বাড়ীর শনি মঙ্গলবারের মত। জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী এবং শিব অষ্টমীতে এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়, চারিদিগের জলের খালগুলি (সিন্ধুর জল থেকেই উৎপন্ন) তখন তীর্থযাত্রীদের ডোঙ্গা ও হাউস বোটে পূর্ণ হোয়ে যায় ; দান-ধ্যান,

বেদমন্ত্র গান পূজাপাঠে চতুর্দ্দিক গম গম করে। পূজার মণ্ডপটীতে কয়েকটা ছবির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও একটি ছবি রয়েছে দেখলাম—বোঝা গেল স্বামীজীর সঙ্গে এখানের যোগাযোগ এঁরাও জানেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর পরমযোগী বিশ্ববরেণ্য বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষীর-ভবানীতে মায়ের মন্দিরে তপস্যা কোরতে আসেন। কাশ্মীরে আসার পর থেকেই ক্রমে তাঁর মন শুষ্ক জ্ঞানপথ ছেড়ে ভক্তিপথে আসতে আরম্ভ করে এবং নির্গুণ ব্রহ্মের বদলে শক্তিময়ী মায়ের পায়ে স্মরণ নেয়। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি কাশ্মীরে আসেন এবং অমরনাথ প্রভৃতি দর্শন কোরে কাউকে কিছু না বলে একদিন অদৃশ্য হোয়ে যান। এই সময়েই স্বামীজী ক্ষীর ভবানীতে ধ্যান জপ-পূজা আরতীভোগ দ্বারা সাধারণ ভক্তের ন্যায় মায়ের উপাসনা করেন। শক্তি-মন্ত্রে সম্ভবতঃ এখানেই তাঁর পূর্ণসিদ্ধি লাভ ঘটে, কারণ এখান থেকে শ্রীনগর ফিরেই তিনি শিষ্যদের বলেন—"এখন আর হরি ওঁ নয়—এখন শুধু মা।" ইতিপূর্ব্বে এই কর্ম্মযোগীর মনের ওপর যে কর্ম্মশক্তির একটা আবরণ পোড়েছিল—এখানে মাতৃমন্ত্রের সাধনায় তা সরে যায়। এখানে সাধনার সময় "বীরবাণীর" লেখক এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর মনে হোয়েছিল—দেবীর এই মন্দির বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ধ্বংস হোয়েছিল, তখনকার হিন্দুরা নীরবে এই অত্যাচার সহ্য কোরেছে; প্রতিকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি। আমি যদি

সে সময় থাকতুম কখনও এরকম হোতে দিতুম? কখনও না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা কোরতুম। যখন তিনি এই চিন্তা কোরছিলেন তখন তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন "বিধর্ম্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার মূর্ত্তি কলুষিত করে—তাতেই বা কি? তোর তাতে কি? তুই আমায় রক্ষা কোরেছিস, না আমি তোকে রক্ষা কোরেছি?

কিন্তু এর পরও চিন্তার স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চোল্ল; তিনি ভাবতে লাগলেন এই জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের বদলে যদি একটা নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে দিতে পারি ত বেশ হয়। আবার সহসা দৈববাণী শুনে তিনি চমকিত হোলেন—স্পষ্ট শুনলেন, মা বোলছেন—"ওরে আমি মনে কোরলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন কোরতে পারি। এই মুহূর্ত্তেই এখানে সাত-তলা সোনার মন্দির হোতে পারে।"

এর পর থেকে স্বামীজীর কর্ম্ম স্পৃহা কোমে আসে; এখান থেকে ফিরে তিনি বোলতেন—"আমার স্বদেশের ভাবনা ভাববার কি দরকার? আমি ত ক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র।" এ ছাড়াও সাধনা-জগতের অনেক গুহ্য তথ্য এখানে তিনি উপলব্ধি করেন।

পূজা পাঠ সেরে বাসে ফিরতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু বেশী দেরী আমাদের সকলের হোয়েছিল। বাসে

৩।৪ জন ছোকরা যাত্রী, সম্ভবতঃ অহিন্দু, এজন্য আমাদের প্রতি —বিশেষ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটূক্তি কোরল। এর ফলে উভয় পক্ষে বেশ একটু কথান্তর হোয়ে মনান্তর ঘোটল। শুনলাম ইতিপূর্ব্বে অন্যদিন এঁরা আমাদের সহযাত্রীদের অনেকের সঙ্গে অন্য জায়গায় অত্যন্ত অভদ্রতা কোরেছিলেন কিন্তু আজ আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, গরিষ্ঠতার গুণে এই গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় আমাদের দাবীই তাদের মানতে হবে— আমাদের ভাবটা ছিল এই রকম। গান্ধীজীর কৃপায় সংখ্যালঘিষ্ঠরাও তাদের দাবীর বিষয়েও সজাগ বেশী, কাজেই তাঁরাও ঠিক কোরলেন পরবর্ত্তী দ্রষ্টব্য মানসবলের প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের দ্বিগুণ সময় ধোরে নিবিষ্টমনে দেখবেন। বাসের মধ্যের আবহাওয়াটা সেই শীতের মধ্যেও বেশ গরম হোয়ে উঠলো।

কিছুদূর এসে ছোট একটা চড়াই স্বুরু হোল। আগটেঙ পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে চোখে পোড়ল "মানসবল হ্রদ" (শ্রীনগর থেকে ১৮ মাইল)। একটু নেমে গিয়ে হ্রদের তীরে বাস দাঁড়াল। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা এটি একটি প্রায় গোলাকার হ্রদ; ব্যাস হবে প্রায় ৩।৪ মাইল। বর্ষায় ও বসন্তে এর শোভা নাকি অতুলনীয়, গভীর নির্ম্মল জলে তখন ফোটে অজস্র পদ্ম। রাশি রাশি কমলের শোভা সৌন্দর্য্য-পিপাসুকে এখানে আকর্ষণ করে। জল এত স্বচ্ছ যে তল-দেশের পাথরের নুড়িগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায়। জলের

উৎস হোল হ্রদের অভ্যন্তরীণ বহু ঝরণা। উৎসারিত উদ্বৃত্ত জল "সম্বলে" গিয়ে বিতস্তার জলে নিজেকে উজার কোরে দিচ্ছে। এর তীরে মাটীর মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একটী হিন্দু মন্দির এবং নুরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য জাহাঙ্গীরের তৈরী দারোগা-বাগ বাগানের ধ্বংসাবশেষ আছে। কিছুদূরে একটী মুসলমান ফকিরের গুহা আছে। এগুলি আমরা দেখতে যাই নাই। এখন শতদল নাই, আছে শুধু শান্ত স্বচ্ছ জলের বুকে তাদের পাতাগুলি; পদ্মের সময় শেষ হোয়েছে, কাজেই আশানুরূপ শোভা আমরা দেখতে পাই নাই। বাসের বিরোধী দলও বিশেষ চেষ্টা কোরে এই শোভায় বেশীক্ষণ মন নিবিষ্ট কোরতে পারলে না। অবশ্য এখানে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মিষ্ট কথায় এঁদের সঙ্গে আপোষ কোরলেন—একদিনের যাত্রাপথের সহযাত্রী আমরা, কি প্রয়োজন মনোমালিন্যে? পরস্পরের সুখসুবিধা দেখতে হবে বৈ কী, এবং আমাদের দেরীটা একটু বেশীই হোয়েছে। এর পর আর ঝগড়া থাকতে পারে না। আবার গল্প-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় বাস গুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো। বাস এরপর পাহাড়ের গায়ে গায়ে চললো।

রাস্তার ধারে বহু বেদানার গাছ—আপনা-আপনি জন্মেছে, আমাদের গ্রাম্য রাস্তার ধারে বনফুলের মত। বেদানা বহু ধোরে আছে, এখন পাকছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কাশ্মীর উপত্যকা ফলে ফুলে ভোরে ওঠে। শরতের কাশ্মীর ভরা-যৌবনা, তার অন্তরের সমস্ত রস বিচিত্র রঙে রূপে বাইরে

উছলে পড়ে। আপেল, নাসপাতি, বাগুগোসা, আলুবখরা, পিচ, আখরোট এ সময়ে অজস্র ফলে, বাদাম, পেস্তাও দুর্লভ নয়। শ্যামল প্রান্তরে, বিভিন্ন উদ্যানে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-পল্লবের প্রাচুর্য্য এ সময়ে না থাকলেও একান্ত অভাব থাকে না।

ক্রমে হরমুখ পর্ব্বতের গায়ে বেশ উঁচুতে বাস উঠল— অনেকখানি নীচে উলার হ্রদের জল দেখা গেল। কিন্তু হায় কোথায় উলারের কাজল জল! কোথায় বা পদ্মবনে ভ্রমরের গুঞ্জন? তীরের কাছে উলুখাগড়ার মত বড় বড় ঘাস; বহুদূর পর্য্যন্ত জল শুকিয়ে পাঁক বেরিয়ে গেছে—তার মাঝে মাঝে খাল কাটা, তার ভেতরেই ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে। এ ম্লান সৌন্দর্য্য দেখতে এতদূর পথশ্রম পণ্ডশ্রম বোলেই বোধ হোল। উলারকে অনেকখানি বেড়ে বাস থামলো বন্দীপুরা সহরে। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে, কাজেই ছোটখাট সহর। এখান থেকেই গেছে গিলগিট গিরিবর্ত্মের পথ। কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালার দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনীর ভেতরে এই একটী মাত্র দ্বার সারা কাশ্মীর তথা ভারতকে উন্মুক্ত কোরে দিয়েছে মধ্য এশিয়ার দিকে। এই পথেই অতীতে শক হুন ভারতে এসেছে। এই দরজাটী দখলে রাখার জন্যই ইংরেজ চেয়েছিল কাশ্মীরকে করায়ত্তে রাখতে এবং আজও পাকিস্থানের পেছনে ইংরেজ-আমেরিকানদের যে উস্কানি—তাও এই পথটীর ওপর ওদের আধিপত্য অটুট রাখার জন্যে; পাকিস্থানকে

আমেরিকা সামরিক সাহায্য দেবে বলায় রাশিয়ার রাগও এই পথটীর জন্য। বন্দীপুরা থেকে ট্রেগবল, গুরেজ, বুর্জিল গিরিসংকট, এ্যাসটর, বুনজী হোয়ে গিলগিট যেতে হয় (বন্দীপুরা থেকে ১৯৩½ মাইল, শ্রীনগর থেকে ২২৮ মাইল)। এ পথে যেতে হোলে পূর্ব্বেও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এখন ত এটী পাকিস্থানী এলাকায়। আজ যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা যেখানে টানা হোয়েছে তাতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানের পকেটে গেছে, অবশ্য একথা ঠিক যে তার প্রায় অধিকাংশই পর্ব্বতসঙ্কুল।

বন্দীপুরা থেকে প্রায় সমতল দিয়ে বাস অনেকখানি এসে ছোট একটী পাহাড় চড়াই কোরল, বাঁয়ে পাহাড়ের মাথায় শঙ্করাচারিয়া মন্দিরের ধরণের একটি মন্দির, তার নীচেই উলার—হঠাৎ ভ্রম হয় ডালের ধারে শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের কোলেই ফিরে এসেছি নাকি! এ পাহাড়টীর নাম স্কুকুর-উদ্দীন, উচ্চতা ৭০০ ফিট; পাহাড়ের মাথায় মন্দিরটী স্কুকুর উদ্‌দীনের জিয়ারাৎ।

উলারের পশ্চিমে এই পাহাড়টীর মাথায় দাঁড়ালে উলারের অনেকখানি আয়তন চোখে পড়ে; এদিকের জল কিছু গভীর। ভারতের মধ্যে ত বটেই—সম্ভবতঃ এশিয়ার মধ্যেও উলারই হোল সবচেয়ে বড় সুস্বাদু জলের হ্রদ। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে লম্বায় এটী প্রায় ১৫ মাইল, পরে (শরৎকালে) জল অনেক কমে যায় এবং তখন ধারগুলি আগাছায় ভরে যায়; মশাও হয়

উলারের কমল বন (পৃঃ ১০৭)

উলারে' মাছ ধরা

(পৃঃ ১০৩)
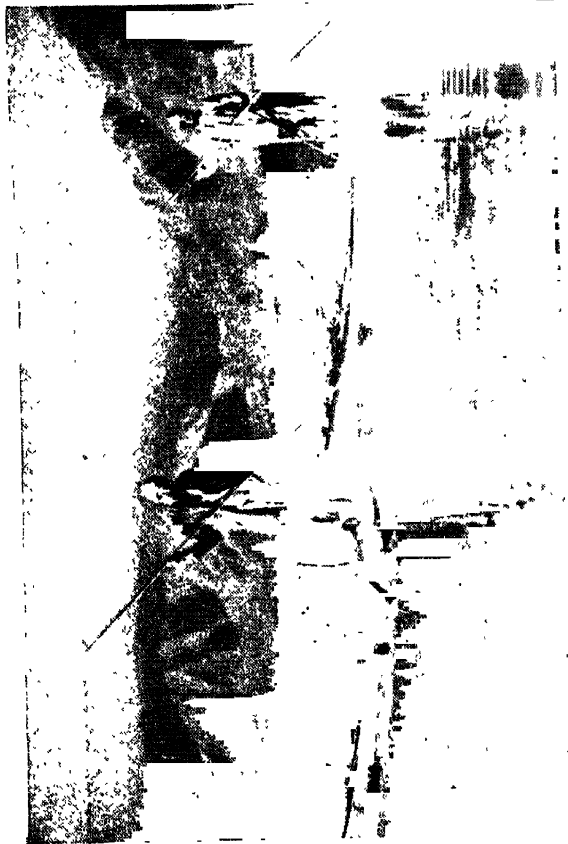
প্রচুর। বিতস্তা নদী উলারের এক ধারে ঢুকে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে বারামুল্লা হোয়ে নীচে নেমে গেছে, কাজেই হ্রদের জল একবারে আবদ্ধ নয়—বহমান।

উলারের কোলে তাঁবু ফেলে তার সকমল শোভা দেখতে হোলে এপ্রিল-মে মাসই প্রকৃষ্ট সময়। ওয়াটলাব, টারমিনাস, কুনস, ডাচিগাম্ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁবুতে বা হাউসবোটে এসময় বেশ লাগে। বন্দীপুরা থেকে গিলগিটের পথে ১০ মাইল দূরে ট্রেগবল গ্রামটী থেকে সমস্ত উলার দেখা যায়; এখানে একটি ডাকবাংলা আছে। শরৎকালে জল অনেকখানি কোমে যায়, কাজেই কমল-শোভাও যায় শুকিয়ে। পদ্ম ছাড়া এর জলে পানিফল হয় প্রচুর, আর হয় মাছ। উলারের সুস্বাদু মাছ শ্রীনগরের বাজারেও বিক্রী হয়। এখানে খেয়া জাল দিয়ে সাধারণতঃ মাছ ধরে না। স্বচ্ছ জলে মাছগুলিকে বর্শা বিদ্ধ কোরে নৌকায় তোলা হয়, অথবা ছোট ছোট গোলাকার জাল বা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। ফোর্স, মাহশীর ও ট্রাউট সাধারণতঃ এই তিন রকম মাছ এখানে পাওয়া যায়। শ্রীনগরের শীকার বিভাগ থেকে (Game Warden) দৈনিক সাত থেকে ১০৲ টাকা (বা সপ্তাহে ত্রিশ টাকা) দক্ষিণা দিয়ে মাছ ধরার লাইসেন্স নিয়ে মৎস্য-শীকারীরা এখানে মাছ ধোরতে পারেন। বলা বাহুল্য মাছ ধরার সব সরঞ্জামই ভাড়ায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা শ্রীনগরে আছে। মাছ ধরার সরকারী সময় হোল এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরেই সুস্বাদু মাহশীর মৎস্য মেলে। শ্রীনগরে আমরা কয়েকদিনই এই মাছ খেয়েছিলাম। উলার ও বন্দীপুরা ছাড়া সিন্ধু উপত্যকা, লীদার উপত্যকা, গুরেজ, কুলগাম্ প্রভৃতির নদীতে মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। মাছ-শীকারীদের বোলে রাখা ভাল যে সিন্ধু, লীদার কিষণগঙ্গা প্রভৃতির খরস্রোতে ছিপসূতা শক্ত পোক্ত দরকার। কোকরনাগ, ভেরীনাগ, আচ্ছাবল প্রভৃতির ছোটখাটো নদী-গুলিতে সাধারণ ছিপেই কাজ চলে। টাটকা ছাড়াও মাছ শুকিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ কাশ্মীরে আছে।

শীতকালে চতুর্দ্দিক থেকে বহু জলচর পাখী উলারের জলে এসে বাসা বাঁধে। গ্রীষ্মে ও শরতে আসে শত শত বুনো হাঁস (duck), কাজেই নিরীহ পাখী শিকার কোরে যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা সে সময় এখানে যথেষ্ট "গেমস্" পাবেন। এর সহকারী "সিজ্‌ন" সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল। বাঘ ভাল্লুক মারবার সখ ও সাহস যাঁদের আছে, তাঁদের "সিজ্‌ন" পনেরই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই মার্চ্চ। কালো ও লাল ভাল্লুক, চিতাবাঘ, কস্তুরী মৃগ, হরিণ, নেকড়ে এবং ঐ জাতীয় নানা শীকার জম্মু ও কাশ্মীরে মেলে। ভারতের লাইসেন্সওয়ালা বন্দুকেই কাজ চলে। টোটাও এখান থেকে সঙ্গে নেওয়া ভাল। শীকারের জায়গায় সরকারী লাইসেন্সওয়ালা "গাইড" পাওয়া যায়। আর সরকারী দপ্তরকে লিখলে বা জিজ্ঞাসা কোরলে অন্যান্য সব খবর এমনকি প্রত্যেক জায়গায় থাকার জন্যে ডাকবাংলা

অথবা তাঁবু ফেলার জায়গার ব্যবস্থা কোরে দেয়; অবশ্য মূল্য বিনিময়ে—কারণ কাশ্মীর রাজ্যের আয়ের একটা মোটা অঙ্ক আসে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে। অর্থবিদ্দের ভাষায় এরা হলেন—"পরোক্ষ রাজস্বসূত্র।"

উলারের জলের মাঝে (বন্দীপুরা নালা যেখানে মিশেছে) একটী পরিত্যক্ত দ্বীপ ও তার ওপর কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। এ দ্বীপটির নাম লঙ্কা বা জৈন লঙ্কা। জৈন-উল-আবদীন এই দ্বীপটির সংস্কার কোরে এখানে বারদোয়ারী ও কয়েকটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান; সেইজন্য তাঁর স্মরণে এর বর্ত্তমান নাম জৈন-লঙ্কা। এই লঙ্কার ইতিহাস কিন্তু আরও প্রাচীন। কথিত আছে এই দ্বীপটী পূর্ব্বে আরও অনেক বড় এবং ঘন বসতিপূর্ণ ছিল। এ লঙ্কার রাবণ, রাজা সুন্দরসেন যেমন অত্যাচারী তেমনি দুশ্চরিত্র ছিল। রাজার অনুকরণে প্রজারাও ক্রমে তেমনি চরিত্রহীন ও নিষ্ঠুর হোয়ে উঠল। এর ফলে ভগবানের অভিশাপে একদিন এই নগরীটি হ্রদের জলের নীচে নিমজ্জিত হোয়ে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেল। অতীত ইতিহাসের এই সূত্র ধোরে বোধ হয় জৈন-উল-আবদীন আবিষ্কার করেন এই জলমগ্ন সহরটাকে। ডুবরী দিয়ে তিনি জলের ভেতরের বহু মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান এবং নূতন কোরে মাটী ফেলে আবার এই দ্বীপটিকে সৃষ্টি করেন। সেই নূতন দ্বীপে আবার গোড়ে উঠল মন্দির, মসজিদ অট্টালিকা—

এবং তার নূতন নামকরণ হোল জৈন-লঙ্কা। কিন্তু কালের করাল কবলে আবার তা ধীরে ধীরে ধ্বংস হোল, লঙ্কা আজ হৃতশ্রী, বাইরে থেকে চোখে পড়ে তার ওপরের আগাছা, তারই ভেতরে এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় পাথরের থাম-ভাঙ্গা খিলান, একটী বড় হিন্দু মন্দিরের নীচের কিছু অংশ। বর্দ্ধমান বনানী এগুলিকেও অবিলম্বে বিলুপ্ত কোরবে বোলেই মনে হয়।

শুকুর-উদ্দীন পাহাড়ের মাথায় বাস দাঁড়াল, উলারের দৃশ্য দেখা ও ফটো তোলার জন্য। প্রায় সকল কাশ্মীর যাত্রীই সঙ্গে একটা ক্যামেরা নেন, কিনেই হোক বা চেয়েই হোক। এটা একটা ফ্যাশন—অথবা কাশ্মীরের বহু শ্রুত দৃশ্যাবলীর ছবি নিজের হাতে তোলার আনন্দের জন্যও হয়ত। এখান থেকে উৎরাই কোরে সমতল ভূমিতে খানিকটা এসে বেলা প্রায় দুটোয় বাস থামলো ওয়াটলাবের ডাকবাংলার সামনে।

উলারের পশ্চিমতীরে ওয়াটলাব, সেখানে জলের ধারে কমল-বনের মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজন হবে, তার একটা মানসিক সুন্দর চিত্র সকলের মনে ছিল, কিন্তু কোথায় উলারের কালো চিকণ জল? ড্রাইভার বোল্লে এপ্রিল মে মাসে এখানে জল থাকে; এখন জল প্রায় তিন মাইল দূরে সরে গেছে। সকলেই ক্ষুণ্ণ হোলেন, কেউ কেউ খাপ্পা। তাঁরা যাবেনই উলারের জলে। ড্রাইভার বোল্লে—এক দেড় ঘণ্টা সময় এখানে আপনারা পাবেন, যা খুসী কোরতে পারেন। যাত্রীরা সব

ছড়িয়ে পোড়লেন। ডাকবাংলার মাঠে বোসে অনেকেই খাওয়া দাওয়া কোরলেন।

বলা বাহুল্য আহার সকলেই শ্রীনগর থেকে সঙ্গে এনেছিলেন ডাকবাংলার কাছেই আছে একটি ছোট ঝরণা। মালীটাও যথেষ্ট সাহায্য কোরলে। পাহাড়ের কোলে নির্জ্জন সমতলভূমি হিসাবে ওয়াটলাব ভাল লাগলো—এছাড়া এর অন্য কোন আকর্ষণ নাই।

ওয়াটলাব ছেড়ে কয়েক মাইল এসে গাড়ী থামলো সোপুর সহরে। পূর্ব্বে বোলেছি অবন্তী বর্ম্মনের ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্য এখানে বিতস্তার খাল কেটে উদ্বৃত্ত জল বের করার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই নামে এর নাম হয় সূর্য্যপুর ক্রমে তা রূপান্তরিত হোয়েছে সোপুরে। এটি বন্দীপুরার চেয়ে বড় সহর। এখান থেকেই যেতে হয় সারদা মহাপীঠ। এখানকার বাজারে আখরোট শ্রীনগরের চেয়ে সস্তা। ১৮।২০ সের ওজনের একটি আপেলের বাক্সের দাম ১০।১২৲ টাকা। এ সহরটীও পাকিস্থানী হানাদাররা দখল করে, কিন্তু এটী তারা পুড়িয়ে ধ্বংস করেনি। লুঠ, নারীধর্ষণ, হিন্দু নিধন এসব যথারীতিই হোয়েছিল, কিন্তু সহরটির কোন ক্ষতি করেনি, কারণ তখন পাকিস্থান ধোরেই নিয়েছিল যে কাশ্মীর তাদের দখলে এসেই গেছে; কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যের বন্দরটীকে নষ্ট না করাই উচিত। অবশ্য ৩।৪ দিন পরেই তাদের সহরটী ছেড়ে পালাতে হয়। কাশ্মীর উপত্যকার অন্যতম

পার্শ্ব অধিত্যকা "লোলাব অধিত্যকা" যাবার প্রধান পথও সোপুর। বন্দীপুরা, আলুসা, দোবগা এবং বারামুল্লা থেকেও লোলাব অধিত্যকায় যাওয়া যায় কিন্তু সোপুরের রাস্তায় গেলে মোটর বা টাঙ্গা অধিত্যকার দরজা পর্য্যন্ত যায়; সোপুর থেকে ২১ মাইল পর ক্রুগমূলা এবং তার তিন মাইল পর কুপওয়ারা। এখান থেকেও সারদা মহাপীঠে যাবার একটি রাস্তা আছে। কুপওয়ারা থেকে ৪ মাইল পথ পাহাড়ের কোলে কোলে খুমব্রিয়াল গ্রামে গেছে; এখান থেকে একটি রাস্তা সেতু পেরিয়ে গেছে লোলাব অন্যটি গেছে কোট্রাস। এই অধিত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ মনোরম। লোলাব থেকে আরও আগে অনেকগুলি ছোট বড় পাহাড়ী গ্রামে এগিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এ অঞ্চলটা আজ আমাদের অধিকারের বাইরে পাকিস্থানের আওতায়।

সোপুর থেকে অনেকখানি সমতল পথ দিয়ে বিকেলের দিকে বাস এল 'বারামুল্লা' সহরে। কাশ্মীর উপত্যকার এই অঞ্চলের এটি বৃহত্তম সহর ছিল। 'কাবালী' অর্থাৎ আফ্রীদি হানাদারদের হত্যায় ও লুণ্ঠনে সহরটী শুধু সর্ব্বস্বান্তই হয় নাই, প্রায় নিশ্চিহ্ন হোয়েছিল—সহরের সামান্য কয়েকখানা বাড়ীমাত্র এদের অগ্নিদাহের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। সে ক্ষতের চিহ্ন আজও সহরের প্রায় সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে, তবে খুব দ্রুত তা

মিলিয়ে গিয়ে নূতন সহর গড়ে উঠছে। সে তুর্য্যোগ রাত্রির দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে এখানের লোক এখন যেন নূতন প্রভাতে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে উঠেছে। আবার বাজার হাট জমে উঠেছে, মন্দির মাথা তুলেছে, কাঠ ও ইটের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। এখানে একটী সিনেমা আছে ও সৈন্যদের বিরাট এক ছাউনি আছে।

বারামুল্লায় ঢুকতেই একটী ছোট বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে উর্দ্দুতে লেখা একটি মর্ম্মর ফলকের কাছে বাস দাঁড়ায়। এটি হোল শহীদ শেরওয়ানীর স্মৃতি ফলক। শেরওয়ানী আবতুল্লা সাহেবের সমর্থক এবং মুসলীম-লীগ-বিরোধী। তিনি এ অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী নেতা ছিলেন। পাকিস্থানীরা যখন বারামুল্লা দখল কোরলে তখন তারা শেরওয়ানী সাহেবকে ধোরল শ্রীনগর দখল করবার সোজা পাহাড়ী পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে। শেরওয়ানী সাহেব তাদিকে খানাপিনা ও ভোজে আপ্যায়িত কোরে বারামুল্লায় ৩।৪দিন কাটিয়ে দেন এবং পরে এই সব হানাদার সৈন্যকে গুলমার্গের ঘুর পথে নিয়ে যান। গুলমার্গ ধ্বংস কোরে যখন তারা বুঝতে পারলো যে প্রায় বিশ মাইলের ঘুর পথে তারা এসেছে তখন শেরওয়ানী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তারা বারামুল্লায় ফিরে এল এবং তার এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ একটি দেওয়ালের ধারে কাঠের থামে তাকে বেঁধে গ্রামের সকলকে সেখানে জোর করে জড় কোরলে এবং শেরওয়ানীর সর্ব্বাঙ্গ প্রথমে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত কোরলে, তারপর ১৪টি গুলী

কোরে তাকে হত্যা কোরল। এতেও ক্ষান্ত না হোয়ে তার নাক কেটে কপালে লিখে দিল "লোকটী বিশ্বাসঘাতক, মৃত্যুই এর শাস্তি।" মৃত দেহ প্রকাশ্য স্থানে একটী গাছে ঝুলিয়ে রেখে দিল। পাকীস্থানীদের কাছে শেরওয়ানী ছিলেন বিশ্বাস-ঘাতক, কাশ্মীরের তিনি কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা। কাশ্মীর সরকারের সমস্ত সামরিক বাহিনী পাকিস্থানী পঙ্গপালের কাছে পর্য্যুদস্ত ও পঙ্গু হোয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে সাহায্য না এসে পৌঁছান পর্য্যন্ত হানাদারদের ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। বিজয়োন্মত্ত কাবালীরা যদি এইভাবে ভুল পথে না গিয়ে পোড়ত, তাহ'লে ভারতের সামরিক সাহায্য কোন কাজেই লাগত না, কারণ শ্রীনগর ও বিমান ঘাঁটি দখল হোয়ে গেলে তাদের সাহায্য নেবার কেউ থাকতো না। কাজেই শত্রুকে বিপথে বিভ্রান্ত কোরে যে সময়টা শেরওয়ানী সাহেব ভারতীয় বাহিনীকে দিয়েছিলেন তার ফলেই কাশ্মীরের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেল। সেই সময়টুকু না পেলে আজ সমস্ত কাশ্মীর পাকিস্থানের কবলিত হোত।

উপরোক্ত কাহিনী বারামুল্লায় শুনেছিলাম, কিন্তু পরে অন্যত্র পড়েছি যে শেরওয়ানী সাহেব ভারতীয় সৈন্যদের দুর্গম অচেনা পথ দেখাবার জন্য স্কাউটের কাজের ভার নিয়েছিলেন। সম্বল এলাকায় তাঁর মোটরবাইক খারাপ হওয়ায় তিনি যখন সেটা মেরামত কোরছিলেন তখন শত্রুসৈন্য তাঁকে ধোরে ফেলে ও তার প্রতি উক্ত ব্যবহার করে। মকবুল শেরওয়ানী সাহেবের দেশপ্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগ অবলম্বনে ইতিমধ্যেই

কাশ্মীরে নাটক ও লোক-সঙ্গীত রচিত হোয়েছে এবং বারামুল্লার নূতন নামকরণ হোয়েছে মকবুলাবাদ।

কিন্তু বারামুল্লায় আর একজন আত্মত্যাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশপ্রেমিক সৈনিকের স্মৃতিসৌধ থাকা উচিৎ ছিল—যিনি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কোন হিসাব না কোরে অগণিত শত্রু-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পোড়ে তাদের গতিরোধ করেন—নিজের প্রাণের বিনিময়ে। এঁর নাম লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রঞ্জিত রায়। সেরওয়ানীকে শত্রু-পক্ষ বধ কোরে সহীদ নাম দিয়েছে, কিন্তু শ্রীরঞ্জিত রায় সামান্য সৈন্য নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে নিজে বরণ কোরে নেন কর্ত্তব্যের আহ্বানে। কাশ্মীরে ভারত সরকার প্রথম যে সৈন্যদল বিমানে পাঠালেন লেঃ কর্ণেল রঞ্জিৎ রায় ছিলেন তার অধ্যক্ষ। বিমান ঘাঁটীটি শত্রুদলের কবলে কিনা তাও তখন জানা নাই। দেশে কোন শাসন শৃঙ্খলা নাই; রাজার মুসলমান সৈন্যের অধিকাংশ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে; রাজা জম্মুতে পলাতক, প্রধান মন্ত্রী দিল্লীতে—এমন অবস্থায় লেঃ কর্ণেল রায় মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শ্রীনগরে পৌঁছলেন। রাস্তা ঘাট জানা নাই, পার্ব্বত্য পথের কোন্ অজানা ঘাঁটী থেকে শত্রুসৈন্য ঝাঁপিয়ে পোড়বে তার ঠিকানা নাই; অধিকাংশ উপত্যকাই শত্রুদের হাতে, স্থানীয় মুসলমানদের কে শত্রু কে মিত্র চেনা মুস্কিল—এমনি এক আবহাওয়ায় শ্রীরায়কে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হোতে হ'ল।

পরবর্ত্তী সাহায্য কখন আসবে জানা নাই; এদিকে বিরাট শত্রুবাহিনী ক্রমে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসছে, বারামুল্লায় তাদের প্রধান ঘাঁটী। এ অবস্থায় এই সৈন্যাধ্যক্ষ অপেক্ষা কোরতে পারলেন না, তাঁকে ভার দেওয়া হোয়েছে শত্রু সৈন্যের গতিরোধের জন্য। শেষে তিনি মাত্র এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বারামুল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন। হানাদাররা এই প্রধান রাজপথটী ধরে অগ্রসর হয় নাই, বাধাও দেয় নাই; বরং তারা চেয়েছিল এই পথ দিয়ে ভারতীয় সৈন্য এলে পেছনের পাহাড়ী পথ থেকে তাদের ঘেরাও কোরে পিষে ফেলবে, তাছাড়া তাদের একাংশ ভিন্ন পথে শ্রীনগরের দিকে এগিরে চলেছিল। কাজেই প্রায় বিনা বাধায় লেঃ কর্ণেল রায় বারামুল্লায় এসে পৌঁছলেন। বারামুল্লার উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হোল। আট দশ হাজার সশস্ত্র শত্রুসৈন্য একদিকে, আর লেঃ কর্ণেল রায়ের এক কোম্পানী মাত্র হিন্দু সৈন্য অন্যদিকে—কিন্তু এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশপ্রেমিক মুষ্টিমেয় সৈন্যদলের কেউ এক ইঞ্চি পিছু হোটলো না—বরং অভিমন্যুর অমিত তেজে এগিয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্যকে ত্রস্ত চকিত কোরে তুললো। শত্রুসৈন্যরা তখন সঠিক জানতো না পেছনে এদের কত শক্তি আছে—তাই এদের দুর্ব্বার বিক্রমে বিভ্রান্ত হোয়ে পিছু হোটল। এ যুদ্ধে লেঃ কর্ণেল রঞ্জিত রায় এবং তার সাহসী সেনানীরা অধিকাংশই প্রাণ দিলেন, কিন্তু তার ফলে

শত্রুসৈন্যের অপ্রতিহত প্রভঞ্জন-গতি রোধ হোল। এর পর অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় সৈনিকেরা ৮ই নভেম্বর বিকালে বারামুল্লা থেকে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করেন; কিন্তু বারামুল্লার প্রান্তরে এই বীর সেনাপতির সাহস ও শৌর্য্য মহারাণা প্রতাপসিংহ বা গ্রীসের থার্ম্মোপলিস যুদ্ধের বীরদের কীর্ত্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁর দেশের জন্য এই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের দুর্জ্জয় সাহস অনেক পরে ১৯৫২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক মহাবীরচক্র পদক দান দ্বারা স্বীকৃত ও সম্মানিত হোয়েছে। এই পদক দেওয়া হোয়েছে তাঁর বিধবা পত্নী শ্রীমতী শীলা রায়কে। সেই সঙ্গে ঝানগরে এমনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে প্রাণ দেওয়ার জন্য ব্রিগেডিয়ার ওসমানকেও মহাবীরচক্র দেওয়া হোয়েছে। (তাঁর ছোট ভাই মহম্মদ সোভানের হাতে)। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের নামে শ্রীনগরে গান্ধীপার্কের পাশেই ওসমান পার্ক হোয়েছে। কিন্তু লেঃ কর্ণেল রায়ের স্মৃতির জন্যে অথবা অন্যতম মহাবীরচক্র সম্মানভোগী স্বর্গতঃ সেনাপতি লেঃ কর্ণেল ইন্দ্রজিৎ সিংহের স্মৃতির জন্যে কাশ্মীর সরকার কোন কিছু করেন নাই—এটা বেদনাদায়ক। কংগ্রেসী রাজনীতিতে এ ঘটনাটা সাম্প্রদায়িক নয়, কিন্তু এর উল্লেখ হয়ত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বোলে গণ্য হবে।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ১১ই অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বারামুল্লা আসেন। এখানে তাঁর জীবনে একটী উল্লেখযোগ্য

ঘটনা ঘটে। একটী মুসলমান ফকিরের এক চেলা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসত। একদিন তার ভয়ানক জ্বর মাথাধরা হোয়েছে শুনে স্বামিজী দয়াপরবশ হোয়ে তার মাথায় আঙ্গুল দিয়ে কয়েক মিনিট টিপে ধোরতেই লোকটার সব ভাল হোয়ে যায়—এতে লোকটী স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত হোয়ে ওঠে। ফলে তার গুরু মুসলমান ফকির চেলা অবাধ্য ও হাতছাড়া হয় দেখে বিশেষ চোটে যান। স্বামীজীকে ছেলেটীর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেন। তিনি একথা না শোনায় শেষে চোটে তাঁকে শাপ দেন—মাথা ধরা ও বমিতে তিনি এমন আক্রান্ত হবেন যে তাতেই তাঁকে কাশ্মীর ছাড়তে হবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ফকিরের এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

বারামুল্লা থেকে সংগ্রাম ও পট্টন হোয়ে (শ্রীনগর থেকে ১৯ মাইল) পূর্ব্বের রাওলপিণ্ডি-শ্রীনগর রাস্তা দিয়ে সোজা শ্রীনগরে ফিরলাম একশো মাইলেরও বেশী বেড়িয়ে সন্ধ্যা সাতটায়। পট্টনের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বর্ম্মণের আমলের (৮৮৩—৯০১) কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দির আজও পট্টনের অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দেয়)। এই যাত্রাটীর মাথা পিছু ভাড়া ৮৲ টাকা।

যে সব রসলিপ্সু মানসবল ও উলারের ভরা যৌবনের রস উপভোগ কোরতে চান তাঁরা ডোঙ্গা অথবা বড় হাউসবোটে জলপথে এখানে বেড়াতে পারেন। এতে অর্থ ও সময় অবশ্য অনেক বেশী লাগে, তবে অবসর আনন্দে

কাটাবার এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার এ একটী প্রকৃষ্ট পথ। ছোট ডোঙ্গায় এ যাত্রাটীর জন্য ব্যয় হয় ৫০।৬০৲ টাকা; সময় লাগে প্রায় ৫।৬ দিন। হাউসবোটে ৩৫০।৪০০৲ টাকা পড়ে, সময় লাগে প্রায় ১০ দিন। বিতস্তা থেকে সাদিপুর হোয়ে নুরু খাল দিয়ে এলে সোজা পথে উলার আসা যায়। নুরু খাল দিয়ে না গিয়ে সোজা নদীপথে এলে সম্বল ও মানসবল আসা যায়। মানসবল থেকে আবার সম্বল হোয়ে আর একটি সোজা খাল দিয়ে উলার ও বন্দীপুরা যাওয়া যায়। সাদিপুরে সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গম ঘোটেছে, কাজেই এখান থেকে সিন্ধু নদী দিয়ে গন্ধর্বল ও ক্ষীরভবানী যাওয়া যায়। এর পূর্ব্বে যখন কাশ্মীর গিয়েছিলাম জলপথেই আমরা এগুলি দেখেছিলাম। শ্রীনগর থেকে সাদিপুর সম্বল হোয়ে বন্দীপুরা ও মানসবল যাবার গাড়ীর পাকা রাস্তাও আছে। এই সাদিপুর হোল সম্রাট ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত (৭০১-৭৩৪ খৃঃ অঃ) পরিহাস-পুর। আজও তার আশে পাশে ললিতাদিত্যের সময়কার মন্দির, প্রাসাদ ও বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। অতীত স্মৃতির অতলতলে এই সব মৌন ম্লান সাক্ষ্যের সন্ধানে ডুবে যেতে যাঁরা আনন্দ পান, তাঁরা এখানের একমানপুররের কাছে জৈন স্বামীর মন্দিরের, মালিকপুরের ও দিভারগ্রামের ধ্বংসা-বশেষের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের অনেক অকথিত কাহিনীর গুঞ্জন শুনতে পাবেন।

ললিতাদিত্যের পরিহাসপুরের পরিহাস-কেশব মন্দিরের মর্ম্মে বাঙ্গালী জাতির বীরত্বের এক উজ্জ্বল কাহিনী গাঁথা আছে। রাজ-তরঙ্গিনীতে তার উল্লেখ আছে। ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করেন, কিন্তু বীর বাঙ্গলাকে জয় কোরতে না পেরে বাঙ্গলার রাজার সঙ্গে সৌখ্য স্থাপন করেন এবং কাশ্মীরে ফিরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। বাংলার রাজা সরল বিশ্বাসে বন্ধুর দেশে গেলে কৌশলে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই হীনতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে মাত্র ৭০০ জন বাঙ্গালী যোদ্ধা ছদ্মবেশে বাংলা থেকে সুদূর কাশ্মীরে যায়।

তখন প্রবাদ ছিল যে, পরিহাসকেশব ললিতাদিত্যের রক্ষাকর্ত্তা ; যতদিন পরিহাসকেশব আসনচ্যুত না হন ততদিন ললিতাদিত্যকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই এই বাঙ্গালী বীরের দল ছদ্মবেশে দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম কোরে শত্রুর দেশের মধ্যে ঢুকে খুঁজে খুঁজে গেল পরিহাসকেশবের মন্দিরে। এই দেবতার মন্দির সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকতো। তাছাড়া রাজ-ধানীর হৃৎপিণ্ডে এই মন্দির। এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী মন্দিরে পৌঁছে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে বাঙ্গালার জয়ধ্বনি তুললে—জানিয়ে দিলে, তাদের রাজাকে হীন হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা এসেছে এই দুর্গম পথ লঙ্ঘন কোরে শত্রুর গুহায়। জীবন পণ কোরেই এরা এসেছিল—জীবন তারা দিলে বাংলার গৌরবের জন্যে। এদের অমানুষিক বীরত্ব দেখে কাশ্মীরবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাঙ্গালীর বীরত্ব কাশ্মীরীদের মনে আতঙ্কের

সৃষ্টি কোরলে। রাজতরঙ্গিনীর লেখক তাই একে লিপিবদ্ধ কোরতে বাধ্য হোয়েছেন।

গুলমার্গ

সকাল ৮টার বদলে দশটায় বাস ছাড়ল। শ্রীনগরের আশে পাশে পাহাড়ের মাথায় মাথায় তখন শীতের সঞ্চারের সমারোহ সুরু হোয়েছে। দক্ষিণের পীরপঞ্জল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের তুহিন তরঙ্গ—এ সময় গুলমার্গ যাওয়ার প্রশস্ত সময় নয়। নীচে অর্থাৎ শ্রীনগরে যখন বিশ্রী গরম পড়ে তখনই গুলমার্গের গরিমা। সেদিন মাত্র আমরা ৬।৭ জন যাত্রী ছিলাম, সকলেই বাঙ্গালী এবং পূর্ব্বপরিচিত ; কাজেই বেশ ঘরোয়া ভাবেই সেদিন সারা পথটা কেটেছিলো। শুনলাম সরকারী বাস সে বছরের মত সেই শেষ দিন গুলমার্গ গেল, এ বছর আর যাবে না। বারামুল্লার পিচ বাঁধানো পথে পপলার শ্রেণীর মাঝ দিয়ে বেশ জোরেই বাস চোললো। খানিকটা পথ এসে বাঁদিকে বাস বেঁকলো ; সামনের সোজা পথ গেছে পট্টন হোয়ে বারামুল্লা। গুলমার্গের দিকের পথটাও বাঁধান, কিন্তু তত মসৃণ নয়। ১৪ মাইল এসে মাগাম নামে একটী ছোট গ্রাম পোড়ল, এর পরই ধীরে ধীরে চড়াই সুরু হোল। শীতের স্পর্শে পপলারের সবুজ পাতা বিবর্ণ হোয়েছে প্রায় সর্ব্বত্রই। এদিকে পথের ধারে নূতন কোরে পপলার চারা বসান হোয়েছে—পুরাতনীদের কোথাও কোথাও পূর্ণচ্ছেদ চোলছে। এটি রাজ্য সরকারের একটি বড় ব্যবসায়।

দেশ-লাইয়ের কাঠি তৈরীর জন্য পপলারের প্রয়োজন খুব—কারণ এগুলি হালকা ও সহজদাহ্য। কাশ্মীরের যাবতীয় তুঁত গাছও রাজ্য সরকারের এবং রেশমের কারবারও সরকারের প্রায় একচেটে। এ পথের পাশে পাশে তুঁত গাছও চোখে পোড়ল। রাস্তার ধারের পাহাড়ী ঝরণাগুলি উপলবহুল; তারা ক্রমশঃ বেগবতী, বিভক্ত ও বিশীর্ণ হোয়ে উঠতে লাগলো। তাদের স্রোত-ধারাকে পাথরের নুড়ির বাঁধ দিয়ে কৃষকেরা জাঁতা চালাবার ব্যবস্থা কোরেছে। পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর স্রোতধারাকে এইভাবে নিজেদের কাজে লাগানোর বুদ্ধি ও ব্যবস্থা সমস্ত হিমালয়ের পাহাড়ীদের মধ্যেই দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক হাইড্রলিক প্রথায় বিরাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের ব্যবস্থা হোয়েছে—কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এইসব নিরক্ষর পাহাড়ী নিজেদের প্রয়োজনেই আবিষ্কার কোরেছে প্রকৃতির অপচয়িত শক্তিকে কাজে লাগাবার পন্থা। কেদার-বদরীর পথে, মানস-কৈলাসের পথে, নেপালের পশুপতিনাথের পথে, কাশ্মীরের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে এই রকমের জল-চালিত জাঁতা অনেক দেখা যায়।

মাগাম থেকে ১১ মাইল এসে টাংমার্গে গাড়ী থামলো। এখানে খাড়া পাহাড় পথরোধ কোরেছে। এখান থেকে পদব্রজে কিংবা অশ্বপৃষ্ঠে বা মানবপৃষ্ঠে উঠতে হবে। এখানে ভাল ডাকবাংলা আছে এবং নিজেদের মোটর রেখে ওপরে যাবার জন্যে অনেকগুলি গ্যারেজ আছে (ভাড়ায় দেয়)। এখানেই

টাঙ্গাপথের শেষ—তাই নাকি এর নাম টাঙ্গমার্গ বা টাংমার্গ। মোটর যুগের পূর্ব্বে টাংগাই ছিল এ অঞ্চলের দ্রুত যান। এখানে বহু পাহাড়ী ঘোড়া, কয়েকটা ডাণ্ডি ও কাণ্ডী যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করে। সমস্ত ঘোড়ার গুলমার্গ বা তারও উঁচুতে খিলানমার্গ যাওয়ার ভাড়া বাঁধা। টাংমার্গ থেকে গুলমার্গ ১।০, গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গ ১।০ ; (যাতায়াত দ্বিগুণ)। কোন ঠিকাদার সরকার থেকে এ রাস্তার যাত্রীবহনের ঠিকা নিয়েছে। এতে যাত্রীদের একটা সুবিধা এই যে দরে ঠকতে হয় না এবং অসাধু ঘোড়াওয়ালাদের হাতে পড়ার ভয় থাকে না। তবু খদ্দের ধরবার জন্যে সহিসদের মহামারামারি—এর কারণ বখশিস—যা অবশ্য বে-আইনী। কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃই খুশী হোয়ে ২।১৲ টাকা বখশিস দেয়, এটাই তাদের সত্যিকারের উপার্জ্জন।

সহিসরা মাসিক মাত্র ৮।১০ টাকা বেতনে অথবা দৈনিক ৵০ দিন মজুরীতে ঠিকাদারের কাজ করে। বড় গরীব এরা। পূর্ব্বে এখানে আসতো ইংরেজ আমীররা, কাজেই তাদের সংস্পর্শে সহিসরা একেবারে নিরক্ষর হোয়েও বহু ইংরাজী শব্দ বেশ রপ্ত কোরেছে এবং লাগসই কোরে তা কথাবার্ত্তায় ব্যবহারও করে—অবশ্য তার বিকৃতিও বিস্তর। গুলমার্গের আর একতলা ওপর খিলানমার্গ পর্য্যন্তই ঘোড়া ভাড়া করা হোল। যে কোন ঘোড়া বেছে নেওয়া যায়।

এই পাহাড়ী পথটি ১৫০০ ফিট উঠেছে ৪ মাইল ঘুরে।

টাংমার্গের উচ্চতা ৭২০০ ফিট, গুলমার্গ ৮৭০০ ফিট, শ্রীনগর থেকে ২৯ মাইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো এই ৪ মাইল চড়াই পথ "সার্কুলার রোড" শেষ কোরতে। রাস্তাটী বেশ চওড়া, প্রয়োজন হোলে জীপ যেতে পারে এখন; রাস্তাটী কখনও ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কখনও সবুজ ঘাসের ছোট মাঠের উপর দিয়ে, কখনও ঝরণার ধার দিয়ে উঠে গেছে। রাস্তাটী থেকে অদূরের পাহাড়গুলির মাথায় নূতন-পড়া তুষারগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পাশের একটী পাহাড়ের মাথায় বেশ খানিকটা সমতলভূমি—তার নাম তোষময়দান; এখন এটী তুষারে ঢাকা। গ্রীষ্মে অনেক ভ্রমণবিলাসী এখানে যান—দুর্গম পথ চলার নেশায় এবং এখানের কয়েকটা ভাঙ্গা পুরাতন মন্দির দেখতে; গুলমার্গ থেকে এটী ১২ মাইল দূর। বিশ্বস্ত কুলী ও সমস্ত আহার্য্য নিয়ে এই দুর্গম স্থানটিতে যেতে হয়; এখানের হিন্দু-মন্দিরগুলি ভেঙ্গেছিলেন বিগ্রহ-বিদ্বেষী সুলতান সিকান্দার-সা। গ্রীষ্মে এখানে মেষ পালকের দল তাদের মেষপাল নিয়ে থাকে; এখানে নাকি শাদা পাথর (white stone) পাওয়া যায়। ফিরোজপুরের নালা হোয়ে কয়েকটা মার্গ এবং জঙ্গল পেরিয়ে তিন ধাপে এখানে পৌঁছান যায়। খাড়া চড়াই ঠেলে উঠতে হয় বোলে প্রায় তিন দিন লাগে এই কয়েক মাইল পথ উঠতে। প্রথম দিন দানওয়াস, দ্বিতীয় দিন তেজ্জান এবং তৃতীয় দিনে তোষময়দানে পৌঁছান যায়। গুলমার্গের

গুলমার্গের পথ—সার্কুলার রোড

(পৃঃ ১২০
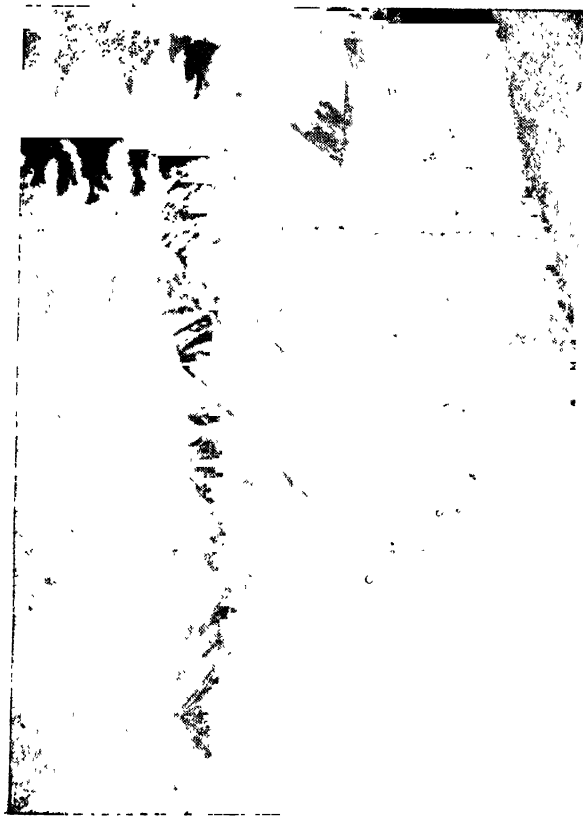
প্রথম দৃষ্টিতে গুলমার্গ (পৃঃ ১২১)

গ্রীষ্মের গুলমার্গ (পৃঃ ১২১)

শীতের গুলমার্গ

(পৃঃ ১২১)

গুলমার্গে স্কী খেলা (পৃঃ ১২১)

শীতের গুলমার্গ (পৃঃ ১২৫)

আশেপাশের ফিরোজপুরের উপত্যকা এবং নালাও প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে অন্যতম দ্রষ্টব্য।

একে শীত, তাতে সেদিন মেঘলা ছিল; পীরপঞ্জলের উত্তর গায়ে গুলমার্গের অধিত্যকায় যখন পৌঁছলাম তখন বরফান ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ের মধ্যে কাঁপুনী ধরাল; ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। এখানে ছোট বড় অনেক হোটেল আছে। খুব বড়দের মধ্যে নিডোজ কয়েকদিন আগে এদিকে তুষারপাতের জন্য তল্পীতল্পা গুটিয়ে নীচে নেমে গেছে শ্রীনগরে, আবার আসছে বছরে আসবে। বাকী ক'টি তখনও টিম টিম কোরছে—তাদের চিমনীর পাতলা বিচ্ছিন্ন ধোঁয়াতেই তা ধরা গেল। খালসা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে গরম কাপড় জামা যা ছিল সব শরীরে চাপিয়ে খিলানমার্গের দিকে যাত্রা কোরলাম।

গুলমার্গের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরের কবি-মহিষী হাবা-খাতুন। কোন সময়ে হয়ত এখানে 'গুল' (গোলাপ) হোত প্রচুর—তাই এর নাম ছিল গুলমার্গ, কিন্তু গোলাপের বদলে ক্রমে এখানে এলো গোলাপী সাহেব, মেম; তারা এখানে বানালো খেলার মাঠ, হকির মাঠ, গল্‌ফ্ খেলার ময়দান; আর শীতের সময় স্কী (Ski) খেলার সরঞ্জাম সাজাল। ভারতের স্কীক্লাবের প্রধান দপ্তর হোল গুলমার্গ। ক্রমে সাহেব-বিবি ভারত ছাড়লো, আর ছড়ালো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ গোলামদের মধ্যে। সেই বিষের জ্বালায় আর পাকিস্থানের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন এলো হানাদারের দল বারামুল্লা

ধ্বংস কোরে গুলমার্গে—এখানের বাড়ী ঘর যা ছিল তার সব কিছু তারা পুড়িয়ে দিলে। শীতের জন্যে আর হয়ত সুলভ বোলে এখানের সব বাড়ীই ছিল কাঠের, কাজেই লঙ্কাকাণ্ড অতি সহজেই সম্পন্ন হোল। লুঠ, ধর্ষণ, হত্যা কিছুই বাদ গেল না, ফলে আজ গুলমার্গের গোলাপী আমেজের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কয়েকখানা বাড়ী ঘর নূতন কোরে গোড়ে উঠেছে, আর কয়েকটী দৈবাৎ বেঁচে গেছে। তবে আজও রোয়েছে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ; মাঝখানে অনেকখানি সমতল পোলোর মাঠ, তিনদিকে উঁচু নিচু রাস্তা এঁকে বেঁকে চোলেছে, মাঝে মাঝে পাইন বা ঐ জাতীয় গাছের শ্রেণী, এক ধারে তুষার-মৌলী গিরিমালা, মাঝে মাঝে ঝিরঝিরিয়ে চোলেছে ছোট ছোট নির্ঝরিণী শান্ত মেয়েটির মত। পূর্ব্বের সযত্নরক্ষিত পোলো মাঠ এখন অবারিত গোচারণ ভূমি—বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বোলতে ইচ্ছা করে "হায় গুলমার্গ তোমার দিন গিয়াছে। শীতের শিশু ইংরাজ নাই তোমার শৈত্যের কদর বুঝিবে কে ?" বছরে সাত মাস সমস্ত গুলমার্গ বরফে ঢাকা থাকে ; জুন থেকে সুরু হয় জনসমাগম।

গুলমার্গের মাঠটি পার হোয়ে ইংরেজ ছেলেমেয়েদের স্কুলের এবং নিডোজ হোটেলের পাশ দিয়ে রাস্তা আবার পাহাড়ে উঠেছে। এ পথটা গুলমার্গের পথের মত অত ভাল নয়, তবে শেষের কিছু অংশ ছাড়া দুর্গম বা বিপজ্জনক নয়। যাত্রী কম ; নির্জ্জনতা একটু বেশী ; বিদেশীর একটু
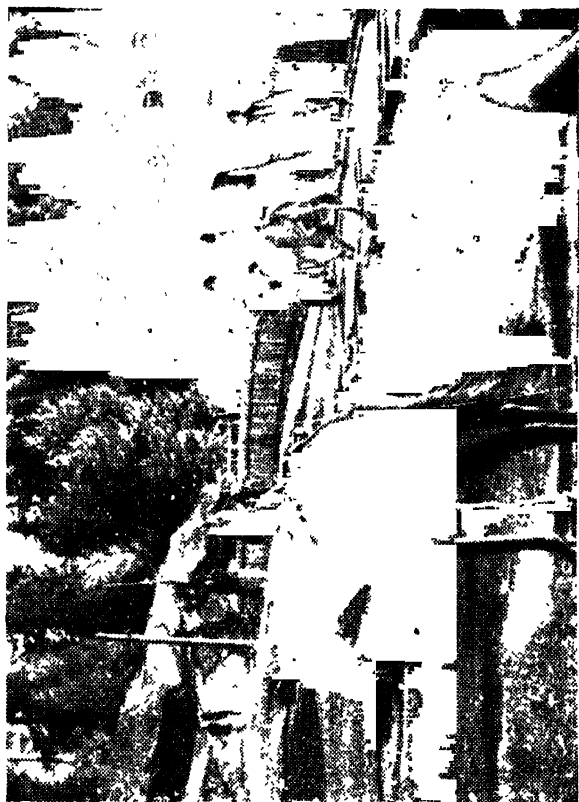
গুলমার্গের একাংশ (পৃঃ ১২২)

তুষরাবৃত ময়দান—গুলমার্গ

(পৃঃ ১২৫)

ভয় ভয় করে। এটি ছাড়াও খিলানমার্গের আরও কয়েকটি কঠিন পথ আছে; দুর্গমের মায়া যাদের হাতছানি দেয়, তাঁরা সেগুলো ব্যবহার কোরতে পারেন। কিছুক্ষণ পর ঘনায়মান মেঘ বর্ষণ সুরু কোরলে। শীতকালে ছাতা সঙ্গে নেওয়ার রেওয়াজ নাই—তাই বিনা ছাতায় ভিজতে ভিজতেই চোল্লাম। ফেরার কথাও মনে উঠেছিল, কিন্তু তখন মাঝ পথে, কাজেই ভিজতে হবেই। ভিজে ফিরে আসার চেয়ে ভিজে এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হোল। এ পথটায় নাকি বৃষ্টি প্রায়ই হয়—তাই পিচ্ছিল, একটু সাবধান হোয়ে চোলতে হয়—তবে অগম্য নয়। আরও ৪ মাইল চড়াই কোরে একটি ক্ষুদ্রতর সমতল অধিত্যকায় এলাম। এর গায়ে এক ধারে একটানা আফারওয়াৎ পাহাড়—এখন ধবধবে তুষারে ঢাকা, অন্যদিকে অনেক নীচে দিগন্তবিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামল সমতল, আর তার মাঝে মস্ত একটা নীলার মত উলারের নিথর নীলাম্বু। খিলানমার্গ অধিত্যকায় একধারে পাইন গাছের পাতলা জঙ্গল, মাঝে গোটা দুই ঝরণা, একটীমাত্র কাঠের কুটীর। হীমশীতল হাওয়ায় বাইরের দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করা সম্ভব হোল না, নীচের দৃশ্যগুলিও মেঘের জন্য সব সময় খুব স্পষ্ট ছিল না। এখান থেকে নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬৭৯২ ফিট) হরমুখ পর্ব্বত (১৬৯০০ ফিট) এবং অমরনাথের পার্শ্ববর্ত্তী কোলাহাই পর্ব্বত (১৭৭৯২ ফিট) দেখা যায়; কিন্তু সেদিন জলদের জালে সবই আড়াল পোড়েছিল।

এখানের ঠাণ্ডা পাতলা হাওয়া কয়েক মিনিটেই পথের ক্লান্তিকে হরণ কোরে নিলে। কাঠের কুঠ্রীটি থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে চা কফি খাবার অনুরোধ জানালো। কিছু আগেই গুলমার্গে খেয়েছি কাজেই আর প্রয়োজন নাই বলায় বোল্লে 'আপনাদের জন্যেই ত এত শীতেও এই ব্যবস্থা কোরে এখানে বোসে আছি: আপনারা 'না' বোললে এখানের এই একটিমাত্র দোকান ও আশ্রয় বন্ধ হোয়ে যাবে, তখন যাদের প্রয়োজন হবে কোথায় তারা আশ্রয় পাবে; সরস পানীয় পাবে? অতএব আপনার প্রয়োজন না হোক—অন্যান্য যাত্রীদের স্বার্থের খাতিরে ভেতরে আসুন।" যুক্তিটা গরজের হোলেও গ্রাহ্যনীয়। কাজেই ভেতরে গেলাম। চা, কফি, ডিম প্রভৃতি হালকা খাবার আর তার সঙ্গে আছে জ্বলন্ত আগুনের মিষ্টি আমন্ত্রণ। যাত্রী ও কুলীদের সকলেই ভেতরে এসে আগুণের আনাচে আঁচ পোয়াতে বোসলেন।

এখানে একটী মজার ঘটনা ঘোটেছিল। যাত্রীদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী মহিলা শীতের জন্যে পুরুষালী ঢঙ্গে পুরো প্যাণ্ট পোরে অনেক গরম কাপড় জামা জড়িয়ে সবশেষে একটা ওভারকোট দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকেছিলেন, মাথায় ছিল কান ঢাকা টুপি; কাজেই তিনি নারী কি পুরুষ বেশ দেখে বোঝা সত্যিই কঠিন ছিল। দোকানী তাঁকে পুরুষ ভেবেই কথাবার্ত্তা বোলছিল, হঠাৎ তিনি আগুনের কাছে এসে টুপীটা খুলতেই মাথার মস্ত খোঁপাটি বেরিয়ে পোড়ল,

খিলানমার্গের একাংশ

(পৃঃ ১২৫)

খিলানমার্গের পথে (পৃঃ ১২২)

খিলানমার্গের অপরাংশ (পৃঃ ১২৫)

কানের দুলগুলি ঝক্ ঝক্ কোরে উঠলো; ব্যাপারটা হাসির হোত না যদি বেচারী দোকানদার এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে তার অসীম বিস্ময় ও অপ্রতিভতা বেসামাল হোয়ে সবার সামনে ব্যক্ত না কোরত। এর ফলে উল্টো কাণ্ড ঘোটল একটু পরে বাইরে। আমাদের জনৈক পুরুষ সঙ্গী একটু বেঁটে খাটো, মুখখানি তাঁর বেশ মিষ্টি—মেয়েদের মতই মনে হয়। তাঁরও শরীর শীতের জন্যে অমনি আপাদ-মস্তক মোড়া; একটা ঘোড়াওয়ালা তাঁকে 'মাইজী' বোলে সম্বোধন কোরে জানতে চাইল তার সাহেব ভেতরে আছে কিনা; হাসির হুল্লোড়ে বেচারী বিব্রত হোয়ে পোড়লেন·; টুপী খুলে প্রমাণ কোরলেন নিজের স্বাজাত্য।

নভেম্বরের প্রথমেই এখানে তুষারে সব আচ্ছন্ন হোয়ে যাবে; ডিসেম্বর জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ এপ্রিল পর্য্যন্ত এখানের ও গুলমার্গে শীতের খেলার সময়। একজন সহযাত্রী আমার সহিসকে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"সাহেব লোক স্কী খেলত কোথায়; স্কী খেলাটি কি?" সহিস্ ছোকরা ধাঁ কোরে জবাব দিলে—"ওপরের ঐ আলপাথর পাহাড় থেকে খিলেনমার্গ সব তখন বরফে এক হোয়ে যায়। সাহেবরা ওপরের আলপাথরে গিয়ে দু'পায়ে লম্বা কাঠ বেঁধে পিছল বরফের ওপর দৌড়াত আর খিলেনমার্গ হোয়ে একেবারে নীচে গুলমার্গের ময়দানে গিয়ে থামতো।" সঙ্গী হেসে বোল্লেন "গুলমার্গের নামের

সার্থকতা বুঝলাম ; এই দেশেই তোমার বাড়ী ত ?" বেচারী আধুনিক বাংলা 'গুল' শব্দের অর্থ না বুঝেই হেসে ঘাড় নাড়লে, হয়ত ভাবলে বাঙ্গালীটাকে খুব ধাপ্পা দিয়েছি।

গ্রীষ্মে খিলানমার্গকে বিচিত্র ফুলের সজ্জায় সাজিয়ে দেন প্রকৃতি দেবী, তখন এর হাওয়া থাকে মিষ্টি, চারিদিকের দৃশ্য স্পষ্টতর। সে শোভা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। এখান থেকে উত্তর পশ্চিমে একটি নালার দক্ষিণ তীর ধোরে প্রায় এক ঘণ্টা গেলে আল্‌পাথর পৌঁছান যায়। গ্রীষ্মকালে যাদের চিরতুষার দেখার সখ তারা আফার-ওয়াং পাহাড়ের কোলে এই চিরতুষারাবৃত হ্রদটী দেখতে যান। এখানে এখন যাবার উপায় ছিল না ; ইচ্ছাও ছিল না এবং সময়ও ছিল না। মে থেকে অক্টোবর এই সব তুষার শৃঙ্গ সফরের প্রকৃষ্ট সময় ; এর মধ্যে বাঙ্গালীদের বোধ হয় মে অক্টোবর বাদ দেওয়াই ভাল। কারণ তখনকার শীতের দাপট তাঁদের পক্ষে প্রায় অসহ্য। এই সব চির তুষারের ভূমিতে যেতে হোলে পর্য্যাপ্ত গরম জামা কাপড়, বেশ ভাল নীল চশমা, কাঁটাওয়ালা বুট জুতো এবং লাঠি সঙ্গে থাকা উচিত। এছাড়া অকস্মাৎ অনাসৃষ্টি বৃষ্টি এসে যাতে সব বরবাদ না কোরতে পারে এজন্য বিছানাপত্র ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে ঢেকে নেওয়া উচিত ; পথে মশারিও মাঝে মাঝে দরকার হয়। এ ছাড়া নিজেদের তাঁবু, ভাঁজ করা খাট, চেয়ার, রান্নার বাসনপত্র ত নিতেই হবে। এ সবই শ্রীনগরে

ভাড়া পাওয়া যায়। কাশ্মীরের এমনি চিরতুষারের দেশে যাবার প্রধান কেন্দ্র হোল গুলমার্গ, পহলগাম, সোনমার্গ।

গত বৎসর খিলানমার্গেই ওপরের পাহাড় থেকে তুষারের বিরাট স্তূপ পিছলে এসে এখানের এক চৌকিদারের বাড়ী-ঘর পরিবারবর্গ পিষে নিশ্চিহ্ন কোরে নেমে যায় নীচে। চৌকিদার অন্যত্র গিয়েছিল; ফিরে এসে দেখলে কঠিন তুষারের চলন্ত চাপ নির্ম্মম কালচক্রের মত তার মায়ার সব বাঁধন নিশ্চিহ্ন কোরে দিয়েছে। লোকটী কিন্তু পাগল হয় নাই—নিয়তির নির্ম্মম বিধান নীরবে মেনে নিয়েছে; চায়ের কুটীরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রীদের কাছে সাহায্যের জন্যে—দোকানী তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে যাত্রীদের কিছু দান কোরতে অনুরোধ করে।

মাথার ওপর মেঘ ক্রমশঃ ঘোরাল হোয়ে উঠছিল, তাই ফেরার পালা সুরু হোল। বাঙ্গালী মেয়েদের অনেকেই এই প্রথম ঘোড়ায় চোড়লেন; পাহাড়ে চড়ার আনন্দের ও আতঙ্কের মাত্রাকে তা আরও চড়িয়ে দিয়েছিল। পুরুষরা কেউ কেউ গুলমার্গের ময়দানে ঘোড়া ছোটাবার চেষ্টা কোরলেন; কিন্তু ঘোড়ার গতিছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বেসামাল হোয়ে পোড়লেন; বেগতিক দেখে দলের সঙ্গ না ছাড়ার অজুহাতে ক্ষান্ত দিলেন।

যাত্রা শেষে টাংমার্গে এসে ঘোড়ার ভাড়া ঠিকাদারের লোকের হাতে দিতে হোল—এতক্ষণ ধারে কারবার চোলছিল।

শ্রীনগর ফিরলাম সন্ধ্যায় ; রাস্তায় দোকানে তখন লালচে বিজলি বাতি টিম্‌ টিম্‌ কোরছে।

সিন্ধু উপত্যকা ও সোনামার্গ

সোনমার্গ বা সোনামার্গ নাম কেন হোয়েছিল ; কোন সময় এখানে সোনা পাওয়া যেত কিনা বা মার্গগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বোলে এর নাম সোনামার্গ তা সঠিক জানতে পারি নাই। সিন্ধু উপত্যকার প্রায় শেষ সীমান্তে সোনামার্গ উপত্যকা ; কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের বুকে ৮৬০০ ফিট উঁচুতে এই সমতল অধিত্যকা ; এর থেকে আরও প্রায় ২০ মাইল দূরে সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থল। সিন্ধুনদের তীর ধোরেই এখানে আসতে হয় তাই এ অঞ্চলের অন্য নাম সিন্ধু উপত্যকা (Sind valley)। পূর্ব্বে ৬।৭ দিন পায়ে হেঁটে পরিব্রাজকেরা শ্রীনগর থেকে এখানে পৌঁছতেন ; কিছুদিন আগে মহারাজার আমলে সোনামার্গ পর্য্যন্ত সড়ক তৈরী হোয়েছে, যার বুকে মোটর ও বাস বেশ স্বচ্ছন্দে সঞ্চরমান।

বারামুল্লার দিকে আক্রমণে ব্যর্থ হোয়ে পাকিস্থানীরা শেষে এই পথ দিয়ে শ্রীনগরে সৈন্য পাঠাবার শেষ চেষ্টা কোরেছিল। এর আশেপাশের মুসলমান এলাকায় পাক চরেরা সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে শ্রীনগরের থেকে বহুদূরে অবস্থিত গিলগিট এলাকায় মুষ্টিমেয় রাজসৈন্যকে হটিয়ে এবং রাজপ্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এই বিদ্রোহীদের শুধু পাকিস্থানী ও উপজাতীয়রাই

ছিল না, মহারাজার মুসলমান পুলিশ বাহিনীর প্রায় সকলেই এবং স্কাউটেরাও যোগ দেয়। তারা ক্রমে বালটিস্থানে ও সোনামার্গ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই পথ ধোরে তারা পূর্ব্বদিক থেকে শ্রীনগর দখলের বন্দোবস্ত করে, কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার প্রতিরোধ করে। সোনামার্গের চারধারের পাহাড়-গুলির উত্তরে ও পশ্চিমে শুনলাম এখন পাকিস্থানী অথবা তাদের বেনামদার আজাদ কাশ্মীর সরকারের সীমান্ত।

সোনামার্গের পথ বেশ দীর্ঘ। বাস ছাড়ার কথা সকাল ৮টায়; কিন্তু ছাড়ল পৌনে নয়টায়। প্রথমটা উলারের পথ ধোরে গন্ধর্বল এল; গন্ধর্বল থেকেই পূর্ব্বে 'পয়দল-যাত্রীরা' পথের যাবতীয় পাথেয় সঞ্চয় কোরে নিতেন। এখন যাত্রীদের সে দুর্ভোগ ও দুর্ভাবনা নাই। তবে দুপুরের ভোগটা সঙ্গে নিতে হয়, কারণ সোনামার্গে চা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, এত নির্জ্জন। গন্ধর্বলে এখন একটা নূতন জল-বিদ্যুতের কারখানা তৈরী হচ্ছে, এটা চালু হোলে আর নাকি কাশ্মীরে বিদ্যুৎশক্তির সমস্যা থাকবে না। সিন্ধুর জলকে অনেকখানি দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে নালায় নিয়ে এসে এখানে নীচে সিন্ধুর মূল স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হবে। জল-প্রপাতের সেই পতন-শক্তিতে ঘুরবে বিরাট চাকা, আর সে চক্রশক্তি উৎপন্ন কোরবে লক্ষ লক্ষ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি।

'ওয়েলের' কাছে সিন্ধুনদের সেতুটী খারাপ থাকায় যাত্রীদের

সোনামার্গের রুক্ষ পাহাড় (পৃঃ ১৩১)

পথের মাঝে ফটকে ফটকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কোরছে। ক্রমশঃ পথ ওপরে উঠেছে। গুণ্ডের উচ্চতা ৬৫০০ ফিট। পথের ধারে কোথাও ঝরণা, কোথাও শস্যক্ষেত্র, কোথাও ন্যাড়া পাহাড়, কোথাও খাড়া পাহাড়, কোথাও বা আগাগোড়া পাইনে ঢাকা পাহাড়; পাহাড়ী পথের সব বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য এই পথটার আগাগোড়া। সিন্ধুনদটাকে কয়েক বারই এপার ওপার কোরে, পাহাড়ের কোলে উঠে, মাথায় পা দিয়ে, পথটা শান্ত নির্জ্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই সংকীর্ণ উপত্যকায় প্রবেশ কোরেছে। সোনামার্গ পৌঁছল প্রায় বেলা ১২টায়।

সোনামার্গের উচ্চতা ৮৬০০ ফিট; আর গুলমার্গের ৮৭০০ ফিট; কাজেই উচ্চতায় উভয় মার্গই মাথায় মাথায়; কিন্তু গুলমার্গ আর সোনামার্গে তফাৎ অনেক। সুন্দরী দুজনেই—একজন সহুরে, অন্যজন গ্রাম্য। গুলমার্গ তার হোটেল, বিজলী, বিলাসী বিদেশীদের নিয়ে গুমরে গমগম কোরছে, আর সোনামার্গের আছে শুধু শান্ত শ্যামলশ্রীর মিষ্টি মায়া। সোনামার্গে বিজলী নাই, হোটেল বা ক্লাব নাই, কাজেই বিলাসী বিদেশীদের আড়ম্বরের আতিশয্য নাই, হৈ হৈ আর হুল্লোড় নাই। এখানে আছে শান্ত নির্জ্জনতা, সবুজ সমতল ক্ষেত্রগুলির বুকে বিচিত্র বনফুলের অপরূপ বিন্যাস; চারধারে তুষারমণ্ডিত রুক্ষ পাহাড়ের ধ্যানগম্ভীর মৌন স্তব্ধতা, তাদের পায়ের নীচে দামাল ছেলের মত দুর্দ্দম গতিতে চোলেছে সিন্ধুনদ। এখানেও বেশ বড় সামরিক ছাউনী আছে, এদিকের

এইটিই শেষ সমতল ও শেষ ছাউনী। এখানে একটীমাত্র ডাকবাংলা আছে; এর তুখানি ঘর ও বারান্দা যাত্রীদের আশ্রয়-স্থল। শুনেছিলাম এখানে আগুন পাওয়া যায় না, তাই ষ্টোভ, কেটলী ইত্যাদি সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ডাকবাংলার মালী যাত্রীদের আগুন ও গরম জলের ব্যবস্থা করে কিছু বখশিসের বিনিময়ে; তবু যাত্রীদের ভীড় বেশী থাকলে তার পক্ষে সকলের "খিদ্‌মদ্‌" করা সম্ভব না হোতে পারে, এজন্য এখানে নিজেদের আরাম ও আহার্য্যের ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

এখানে যদিও প্রায়ই বৃষ্টি হয়, সেদিন বেশ রৌদ্র ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে রৌদ্রের রুদ্রতা একেবারেই ছিল না। অবশ্য সেই নিস্তেজ রৌদ্র না থাকলে শীতের তেজ যে কত হোত তা বলা মুস্কিল। জুলাই আগষ্টে এখানে বর্ষা, তবে বৃষ্টি খুব বেশী হয় না। গ্রীষ্মকালে এবং সেপ্টেম্বর মাসেও এই অধিত্যকার বিভিন্ন জলধারার তীরে প্রকৃতির নির্জ্জনকোলে তাঁবু ফেলে বাস করেন অনেক সৌন্দর্য্যপিপাসু এবং গ্রীষ্মভীরু যাত্রী। গুলমার্গ থেকে এ অঞ্চলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে—এখানে মাত্র একটাই অধিত্যকা নয়, আশে পাশে পাহাড়ের কোলে, নদীর ধারে অনেকগুলি ছোট বড় সমতল অধিত্যকা আছে; সেখানে ভ্রমণকারীর বা আরামপ্রিয়র দল তুচার দিন কোরে তাঁবু খাটিয়ে ভ্রাম্যমান জীবনের আনন্দ পেতে পারেন। গ্রীষ্ম থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানের আবহাওয়া আরামপ্রদ।

এখান থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর নাকি চিরতুষারের রাজ্য।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রীরা সেখান থেকে বরফ বোয়ে আনার অনেক বাহাতুরী কোরেছিলেন শ্রীনগরে, তাই সেখানে যাবার লোভ হোল। সেদিন তুখানা বাস-বোঝাই যাত্রী গিয়েছিলেন এবং তার বেশীর ভাগই বাঙ্গালী ; কাজেই সেই শীতে চিরতুষারের দেশে যাওয়া হবে কিনা এ নিয়ে প্রথমে সকলের মতের বেশ ঐক্য হোল না, তার ওপর ডাকবাংলার সামনে আগত ঘোড়াওয়ালারা ভাড়া যেন বেশী বোল্লে। যাত্রীরা যাবে না কেউ, এক সময় এমনি মনে হোল। যে যার খাওয়া দাওয়ায় মন দিলেন। কিছুক্ষণ পর ডাকবাংলার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি অর্দ্ধেক ঘোড়া চোলে গেছে এবং বাকী ঘোড়ার সহিসদের সঙ্গে অবশিষ্ট যাত্রীরা কথাবর্ত্তা কইছেন, আর অনেকেই পায়ে হেঁটেই ৪ মাইল পথ পাড়ি দেবেন বোলে যাত্রা স্থরু কোরেছেন চিরতুষারের দেশের দিকে। অগত্যা আমরাও ঘোড়া নিলাম। পুরানো বরফের ওপর নিয়ে যাবে, সেখান থেকে গত সনের বরফ আনা হবে ইত্যাদি সর্ত্তে ঘোড়া পিছু ৩৸০ টাকা ভাড়া স্থির হোল। তুটী ঘোড়ায় তুজনে চোড়লাম। গুলমার্গ ও খিলানমার্গে সম্প্রতি ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ায় অনভ্যস্ত শরীরের সব খিল খুলবার যোগাড় হোয়েছিল—বিশেষতঃ আনাড়ী গৃহিণীর, কিন্তু পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতেও সাহসে কুলাল না। মাঝ পথে পা জবাব দিলে বেচারী শরীরকে অশরীরীদের দলে ভীড়তে হবে !

সোনমার্গ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে পায়ে চলা পথ চড়াই কোরে উঠে গেছে। এই চড়াইএর মাঝামাঝি দুটী ঘোড়ায় আমরা পাশাপাশি চোলেছি, সহিসরা ঘোড়ার মুখ ধোরে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখি আমার স্ত্রী ঘোড়ার জিন সহ কাৎ মারছেন। “গিরযাতা” “পাকড়ো পাকড়ো” বোলে সহিসদের ডাকতে ডাকতে তিনি ভারসমতা হারিয়ে ফেললেন,—ঘোড়াটী কিন্তু তখনও চোলছে। আমার ঘোড়াটীকে তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে ঠেকা দিয়ে ধোরলাম; কিন্তু চলমান ঘোড়ার পিঠ থেকে এভাবে জোর পাওয়া যায় না; কাজেই পতনের গতি কোমল, কিন্তু রুদ্ধ হোল না: এমন সময় সহিসটা এসে প্রায় শেষ মূহুর্ত্তে তাঁকে ধোরে ফেলে পায়ের নীচের পাথরের এবং অশ্বখুরের আঘাত থেকে বাঁচাল। সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রশক্তি না হোক মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাঁকে আমার দিকেই আকর্ষণ কোরেছিল, বিপরীত দিকে কোরলে এবং সেই অসমান প্রস্তরবহুল পার্ব্বত্য-পথে পতন ঘোটলে, বিশেষ কোরে জিনের রেকাবে আটকে যাওয়া পা শুদ্ধ নিয়ে অশ্বতর আরোহীকে যদি খানিকটা টেনে নিয়ে যেত, তাহলে কাশ্মীরের বদলে কাশীপ্রাপ্তি তাঁর সেদিন প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। পরে দেখা গেল জিনটী পুরা কষা ছিল না, কিছু আলগা ছিল—অতএব দুর্ঘটনাটা ঠিক আনাড়ী সওয়ারের জন্যে নয়; সহিসের অনবধানতায় অথবা নেহাতই দৈব দুর্ব্বিপাকেই ঘোটেছিল। ভবিষ্যৎ যাত্রীরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, এই জন্যেই এ ঘটনাটীর উল্লেখ কোরলাম।

সোনামার্গের একাংশ

(পৃঃ ১৩৪)

পথের ধারে

(পৃঃ ১৪৪)
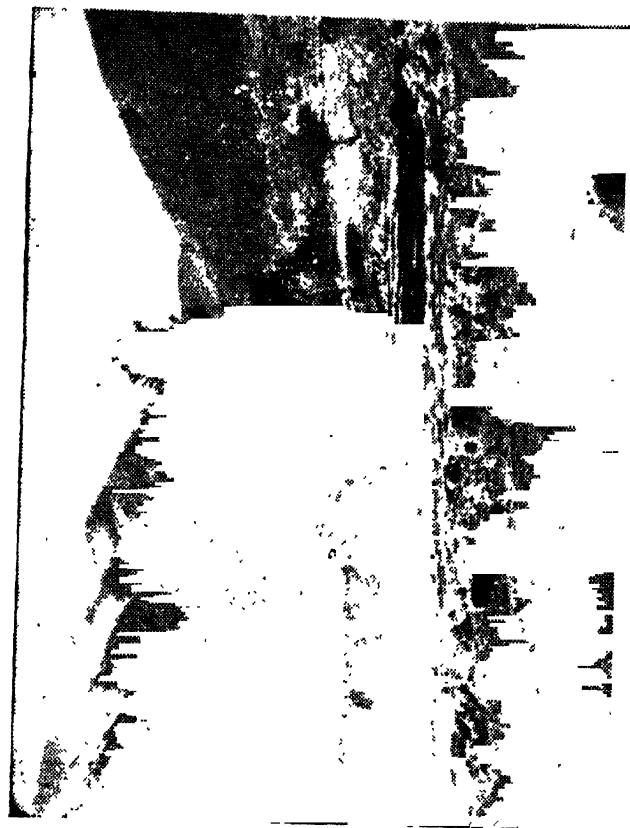
এ অঞ্চলের স্বাভাবিক রুক্ষতার জন্যে বসতি অত্যন্ত বিরল। পাহাড়ের গায়ে গ্রামে যারা আছে তারা অত্যন্ত দরিদ্র। উষর মালভূমিতে ফসল বিশেষ কিছু ফলে না, তাই দিনমজুরীই এদের উপার্জ্জনের প্রধান উপায়—তাও মরশুম ছাড়া মেলে না।

খানিকটা চড়াই উংরাই কোরে "থাজওয়াসের" ডাকবাংলা চোখে পড়ল—এটী ঠিক সাধারণের জন্যে নয়, সরকারী 'সাহেব'দের জন্যে। আরও একটু এগিয়ে নদীর তীরে বেশ সমতল খানিকটা জায়গা। সম্প্রতি (আমাদের যাওয়ার কয়েক মাস আগে) পণ্ডিত নেহেরু যখন সফরে কাশ্মীর আসেন তখন কয়েকদিন এখানে তাঁবু ফেলে তিনি বিশ্রাম কোরেছিলেন। আরও খানিকটা এগিয়ে পেলাম বিস্তৃততর সমতলভূমি, প্রায় চারদিকেই তার বিশালবপু পর্ব্বতমালা—মাঝ দিয়ে চোলেছে শাখা প্রশাখা মেলে এক অগভীর পাহাড়ী নদী। গ্রীষ্মকালে এখানে মেশ-পালকেরা মেষ চরাতে বাসা বাঁধে, তাদের ফেলে যাওয়া পোড়া কাঠ, কিছু অব্যবহার্য্য তৈজসপত্র এখানে সেখানে চোখে পোড়ল। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এই সব সমতলে সবুজ খালের বুকে ফোটে অজস্র বিচিত্র বর্ণাঢ্য বনফুল। তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং বিন্যাস নাকি মানুষের সাজান বাগানকেও হার মানায়, আবহাওয়াও থাকে আরামপ্রদ। কাজেই সে সময়ে এখানে জন সমাগমও হয় বেশী। এখন অক্টোবরে সবুজ ঘাস আছে, নির্ঝরিণীর নৃত্য আছে, কিন্তু হিমশীতল হাওয়ার

স্পর্শে ফুল শুকিয়ে গেছে—মাঝে মাঝে শুধু শুকনো লাল ফুল মরণোন্মুখ গাছে কয়েক যায়গায় চোখে পোড়ল। আর একটু এগিয়ে পায়ে চলা পথও বন্ধ হোয়ে গেল—সামনে বিরাটকায় তুষারমণ্ডিত এক পাহাড় পথ রোধ কোরে দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলাম সামনে পর্ব্বতের মাথায় ঐ তুষারতরঙ্গের তীরে হয়ত আমাদের যেতে হবে; কিন্তু ঘোড়াওয়ালারা ডাইনের একটী পাহাড়ের নীচের দিকে একটুখানি যায়গায় জমাট বাঁধা বরফ দেখিয়ে বোল্লে "ঐ দেখ গতসনের বরফ", কেউ বা বোল্লে "গ্লেসিয়ার"; ঘোড়া আর যাবে না, ঐটুকু পায়ে হেঁটে চড়াই কোরে বরফ আনতে পারেন। ব্যাপারটা বিদ্রূপের মতই শোনাল। কোথায় সাধের 'গ্লেসিয়ার'! বিস্তীর্ণ জমাটবাঁধা চোখ-বাঁধান ঝকঝকে বরফ দেখবো বোলে এত কষ্ট কোরে আসা, আর পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু যায়গায় বরফের খানিকটা জমাট টুকরো দেখিয়ে বোল্লে "ঐ গ্লেসিয়ার"! কেউ কেউ বেকুব বনার জন্যে সহিসদিগকে বকাবকি কোরতে লাগলেন, কেউ বা ঘোড়া ছেড়ে প্রস্তরবহুল পাহাড়টী চড়াই কোরে ওপরে উঠে রুমালে বরফের খানিকটা অংশ সংগ্রহ কোরে নিয়ে এলেন। তাঁদের সংগ্রহেই আনন্দ, সঞ্চয়ে নয়—কারণ ও সঞ্চয় সম্ভবতঃ বাস পর্য্যন্তও পৌঁছবে না। আমাদের ৩।৪ দিন পর যাঁরা এখানে গিয়েছিলেন তাঁরা আবার এটাও দেখতে পান নাই, তখন এটী গলে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে শুনলাম। নূতন পড়া বরফ ঝকঝকে সাদা

আর পুরাতন বরফ ধুলাবালিতে একটু হলদেটে হয়। এরই কাছাকাছি পাহাড়গুলি অপরদিকে কোলাহই গ্লেসিয়ার, কাজেই এ অঞ্চলটা চিরতুষারের। সামনের খাড়া পাহাড়গুলির মাথায় মোড়া নতুন বরফ অস্তমিত সূর্য্যের সোনালী বর্ণে তখন গলান সোনার মত ঝকঝক কোরছিল। এই ৩।৪ মাইল পথ যাওয়া আসায় প্রায় ৩ ঘণ্টা লেগেছিল। বেলা ৫॥টায় বাস ছেড়ে সন্ধ্যায় শ্রীনগর পৌঁছল। এ যাত্রায় বাসের দক্ষিণা মাথা পিছু ৮৲ টাকা।

পহলগামের পথে

পহলগাম তুষারতীর্থ অমরনাথের পথে শেষ সহর। এর পরই হাঁটাপথ সুরু। শ্রীনগর থেকে এর দূরত্ব ৬০ মাইল। পহলগাম যাবার মোটরবাস অনেক কোম্পানিরই আছে; একটু খোঁজ কোরলে ভাড়াও কিছু কম বেশী হয়। ষ্টেট-ট্রান্সপোর্টের বাসের কতকগুলি সোজা পহলগাম যায়, কতক যায় অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদ থেকে আচ্ছাবল বাগান ও কোকরনাগ ঘুরে। আমরা এই দ্বিতীয় পথেই গিয়েছিলাম। যে পথে শ্রীনগরে প্রথম প্রবেশ কোরেছিলাম সেই পথেই বাস চোলল। সকাল ৮টায় বেরিয়ে ৮ মাইল এসে পামপুরের জাফরাণ ক্ষেত্রের পাশে বাস দাঁড়াল। শুভ্রবপু বিশাল পাহাড়ের কোলে বিতস্তার (ঝেলামের) তীরে শস্য ক্ষেত্রগুলি ধাপে ধাপে প্রায় ৫ মাইল চোলেছে। ক্ষেতের কোথাও আবর্জ্জনা নাই, মাঝে মাঝে মসৃণ মাটী

একটু উঁচু কোরে চৌকা-বাঁধা—তাদের বুকে বেগুনে রংএর বহু ফুল। ফুলগুলির বেগুনে পাপড়ীর ভেতর আর একটী কোরে হলদে রংএর পাপড়ী, তার মধ্যে কেশর। ফুলগুলি একেবারে মাটীর বুকেই যেন ফুটে উঠেছে, গাছের কাণ্ড বা পাতা নাই। গাছগুলি গুল্ম জাতীয়, অনেকটা পেঁয়াজের মত। মাটীর ওপর পেলব বৃন্তের মাথায় একটী কোরে ফুল মাটী থেকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি উঁচুতে ফুটে আছে। একটা মৃদুমিষ্টি গন্ধ মাঠময় ছড়িয়ে পোড়েছে। তখনও সব ফুলগুলি ফোটেনি; সব ফুটলে মাঠের মাটী ঢেকে যায় এদের বেগুনে বর্ণে। ফুলগুলি পাকলে ঘন বেগুনে রং ক্রমে হলদে বা জাফরাণ রং হয়। এগুলির জীবন মাত্র মাস দেড়েক, বীজ বোনা থেকে ফুল তোলা পর্য্যন্ত। অক্টোবরের শেষের দিকে শীতের হাওয়ার সঙ্গে ফুলগুলি মাটীর ওপর জেগে ওঠে—আর নভেম্বরের প্রথমে সেগুলি তোলা হয়। নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে তখন দিনে এবং রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোয় সুন্দরী কাশ্মীর-কন্যারা দলে দলে পুষ্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারা গান গায়, আর ফুল তোলে।

কাশ্মীরের গ্রাম্য জীবনে গান আজও বেঁচে আছে নানা সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে বিভিন্ন উৎসবের মাঝে। অন্নপ্রাশন বিবাহ এতে ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে গান হবেই। মাঠের কাজ যখন থাকে না সেই কর্ম্মহীন দিনগুলিতে বা শীতের সন্ধ্যায়

প্রায় প্রতি গৃহে বুড়ী দিদিমা ঠাকুরমার দল মাঝখানে বোসে গল্প বোলবে, আর চার ধারে ছেলে বুড়ো সকলে বোসে চরকা কাটবে, উল পরিষ্কার কোরবে, শালে ফুল তুলবে, উইলো গাছের ঝুড়ি বুনবে, নয়ত অন্য কোন হাতের কাজ কোরবে আর গল্প শুনবে, গল্পের মাঝে হবে গান, তাতে যোগ দেবে সকলে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরের নিজস্ব অগ্নিগর্ভা কেটলী "সামোভার" থেকে নূন মেশানো সিদ্ধকরা চা চোলবে।

'ছকরী' 'লোল' এই সব হোল লোকসঙ্গীত। উৎসবের সময় গানের সঙ্গে থাকে ঢোলক, দাহরা, রাবাব, তাম্বুরা। কখনও হয় গান, কখনও চলে কাহিনী—সুদামা চরিত, রাধা স্বয়ম্বরা, শিব লগন (বিবাহ) কিংবা পারস্য কাব্য ইউসুফজুলেখা, সোহরাব-রুস্তম, হাতেমতাই, লায়লা-মজনু, সিরীন-ফরহাদ, অথবা কাশ্মীরের নিজস্ব উপকথা হিমাল নাগ্রায়া, বোমবুর-লোলের, জোহরা খোটান ও হায়াবান্দ এর কাহিনী। 'ছকরী' হোল গ্রাম্য গান আর কাশ্মীরের খানদানী সঙ্গীত হোল 'সুফিয়ানা'। এর তাল রাগিনী বেশ কসরৎ কোরে শিখতে হয় এবং সিতার, সানটুর, সাজ, সারেঙ্গী, ঘাটা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গৎ কোরতে হয়। জম্মুতে সাধারণতঃ পাহাড়ী এবং কাশ্মীরে ছকরী আর সুফিয়ানার চলন বেশী। লাদাকী সঙ্গীত ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কাশ্মীরের চেয়ে তিব্বতের সঙ্গেই এর সামঞ্জস্য বেশী।

কাশ্মীরের গ্রামে গান যে আজও বেঁচে আছে এর কারণ

বহু শতাব্দীর সংস্কার ও সাধনা। হিন্দু আমলে গানের আসন ছিল খুব উঁচুতে, এমন কি দেবতার মন্দিরেও ছিল তার স্থান। কাশ্মীরেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানেও সমস্ত মন্দিরেই ছিল গানের চর্চ্চা, ক্রমে তা সামাজিক জীবনেও প্রসারিত হয়। আজও ভারতের পশ্চিমে বা দক্ষিণে দেবতার সামনে আরতি বা আরাধনার সময় নারী পুরুষ একসঙ্গে সমস্বরে ভজন গায়, ভজন হলেও তার ভঙ্গী সঙ্গীত; বাংলাদেশেও কীর্ত্তনের কাল পর্য্যন্ত এ জিনিষ ছিল। আজ বাংলার লোকসঙ্গীত লোপ পেতে বোসেছে, বাংলার পল্লী আজ গান গাইতে ভুলেছে, তার বদলে 'কলের গান' আর রেডিও ঢুকেছে।

অশোকের পরবর্ত্তী রাজা জালুকা (২০০ খৃঃ পূর্ব্ব) নিজে সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর রাজসভায় বহুশত সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ক ছিলেন। সম্রাট ললিতাদিত্যও শুধু শূরই ছিলেন না স্বরজ্ঞও ছিলেন। ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ। শৌর্য্যে সম্পদে, স্বরে সঙ্গীতে, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছিল এই ভূস্বর্গ। তাঁর দরবারে এক বিখ্যাত নৃত্যবিদ ছিলেন, তার নাম ইন্দ্রপ্রভা। তখনকার ঐতিহাসিকেরা বলেন কাশ্মীরে প্রতি গ্রামে ছিল নাট্যশালা, সেখানে নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত, যন্ত্রকলা সব কিছুরই নিয়মিত চর্চ্চা চোলত। রাজা হর্ষ, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি নিজেরা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীতের সমাদর কোরতেন। মুসলমান স্থলতানেরাও সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। জৈন-উল-আবদীনের সঙ্গীত প্রীতি

সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আবুলফজল লিখেছেন, এঁর রাজত্বকালে ইরাণ, তুরাণ, খোরাসান থেকে বিখ্যাত গায়ক ও বাদকেরা কাশ্মীরে আসেন। প্রতি বৎসর ইনি সঙ্গীত সম্মেলন কোরে, তাতে ইয়ারকন্দ, সমরখন্দ, তাসখন্দ, কাবুল, পাঞ্জাব, দিল্লী থেকে গায়কদের আহ্বান কোরতেন। এঁর দরবারে 'তারা' নামে এক বিখ্যাত নটী ছিলেন যিনি ৪৯টী মুদ্রায় পটীয়সী বোলে ঐতিহাসিক শ্রীবর পণ্ডিত উল্লেখ কোরেছেন। জৈন-উল-আবদীনের পৌত্র আলিশাহ পারস্য, ভারত, মধ্য এসিয়া থেকে ২০০ সঙ্গীত কুশলীকে দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। এঁদেরও পরবর্ত্তীকালে হাসান শাহার দরবারে ছিল সহস্র সঙ্গীতজ্ঞ। শেষ চকবংশীয় সুলতানের স্ত্রী হাববা বাঈএর সুর ও সঙ্গীতে আসক্তির কথা পূর্ব্বেই বোলেছি। তারপর মোগল আমলেও সঙ্গীতের সমাদর সর্ব্বজনবিদিত। এই সব রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও লালেশ্বরী, আরনিমল, নূর-উদ্-দীন প্রভৃতি ত্যাগী, কবি ও সন্ন্যাসীদের রচিত বহু সঙ্গীতে সমৃদ্ধ কাশ্মীর, তাই আজও তার প্রতিধ্বনি বাজে কাশ্মীর কন্যার কণ্ঠে প্রতি উৎসবে, নৌকার মাঝির দাঁড়ের তালে তালে, গ্রামীণদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ী শ্রমিকের শ্রান্তির দীর্ঘশ্বাসের অবসরে। গজল, সুফিয়ানা প্রভৃতি উচ্চসঙ্গীত রাজদরবার ছেড়ে বেঁচে আছে সুরকার ও কলাবিদদের কণ্ঠে এবং আজও তা ধ্বনিত হয় রেডিও-কাশ্মীরের মারফতে।

এই প্রসঙ্গে মনে পোড়ল এদেশের আর একজন ভগবৎ প্রেমিক মুসলমান ফকির কবিকে, যার ছিল না ধর্ম্মের গোঁড়ামি; প্রতি মানুষকে যিনি দেখতেন দেবতার দেউল স্বরূপ, এঁর নাম নূর-উদ-দীন বা নন্দঋষি। কাশ্মীরের রাজশক্তি যখন ছিল জৈন-উল-আবদীনের মত এক শক্তিমান উদার সম্রাটের হাতে তখনই কাশ্মীরবাসীর আধ্যাত্মিক মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন এই নিরক্ষর ফকির। এঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী চলিত আছে; কিন্তু তা বাদ দিলেও এঁর সরল সহজ গ্রাম্য উপমার দ্বারা রচিত গভীর তত্ত্ব কথার যে সব কবিতা আজও লোকমুখে প্রচলিত, তা থেকেই বোঝা যায় এঁর মানবতার প্রতি আন্তরিকতা; পতিতের প্রতি দরদ ও তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা। তাঁর এই সব উক্তি ও রচনা লিপিবদ্ধ আছে "ঋষিনামা" গ্রন্থে। সাহিত্য হিসেবেও এখানি যথেষ্ট মূল্যবান। এই ত্যাগী ফকির তাঁর প্রেম ও জ্ঞানে হিন্দু মুসলমান সকলের চিত্ত জয় করেন। ৬৬ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ কোরলে সম্রাট জৈন-উল-আবদীন স্বয়ং শবযাত্রার পুরোভাগে থেকে এই সন্ন্যাসীর আত্মার প্রতি সম্মান দেখান।

এই কবি, দার্শনিক, প্রেমিক, ত্যাগী ফকিরের স্মৃতিপূত 'তাসরার শরীফ' আজও হিন্দুমুসলমানের প্রিয়তীর্থ।

কুমকুমের সৌরভ বুঝি মনকে নিয়ে গিয়েছিল সুরলোকে। ফিরে আসা যাক্ কুঙ্কুম বা "কেশরের" বাস্তব বাজারে।

কুমকুম ফুলের মাঝের সরু সরু কেশরগুলি (যার মাথায় থাকে রেণু) পাপড়ী থেকে পৃথক কোরে নেওয়া হয়—এগুলিই শুকিয়ে বাজারে বিক্রী হয়। এজন্য এর স্থানীয় অন্য নাম "কেশর"।

ফুলের বৃন্ত ও দলগুলি থেকে জাফরান হয় না, কিন্তু জাল জাফরান হয়। এগুলিকে শুকিয়ে কাঠের বেলনা দিয়ে পিষে ফেল্‌লেই চেহারাটা অনেকটা ফুলের মাঝের কেশরগুলির মত হয়, তারপর জাফরানের জলে ডুবিয়ে ওগুলিতে রং ধরান হয়; কাজেই জাফরান বাজারে ২৷৹ থেকে ৬৲ টাকা ভরি বিক্রী হয়। জাল জিনিষ ধরার সহজ উপায় একটু জলে এগুলি খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই ওপরের রং ধুয়ে যাবে, আর যা খাঁটী তার রং ধুয়ে যাবার ভয় নাই। জাফরান বা কুঙ্কুম বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের হিন্দুদের সামাজিক জীবনে শুভকাজে ব্যবহৃত হোয়ে আসছে। হিন্দু পতাকার বর্ণ এই রংএর, কারণ কুঙ্কুমের রং মনে জাগায় শৌর্য্য ও ত্যাগ; রাজপুত মারাঠা প্রভৃতি হিন্দুর গৌরবময় অধ্যায়ের পরিচয় বহন কোরে আসছে এই শৌর্য্যের প্রতীক কুঙ্কুম কেতন। আজও ভারতীয় হিন্দু-মহাসভার পতাকার এই বর্ণ। জাতীয় কংগ্রেসের তিনরঙ্গা পতাকার একটীর রং এই কুঙ্কুম, যা ত্যাগ অথবা হিন্দুদের প্রতীক। ঔষধ হিসেবেও জাফরানের ব্যবহার বহুধা; আর বিলাসীর রন্ধনশালায়ও তার প্রতিপত্তি অনেকখানি।

ভারতের বাইরে মাত্র ইটালী ও মরোক্কোতে জাফরান জন্মে, কিন্তু তা এত উঁচুদরের নয়। এমন কি কাশ্মীরেও এই পামপুর অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও জাফরান জন্মে না। তাই বর্ত্তমানের অর্থনীতির ভাষায় ভারতের এটা একটা 'ডলার আর্ণার' সামগ্রী অর্থাৎ রপ্তানী হোয়ে বিনিময়ে বিদেশী টাকা দেশে আনে। কারু কারু মতে কুমকুমকে সংস্কৃত ভাষায় নাকি 'কাশমীরা", বা 'কাশমীরাজা' বলে এবং তাই থেকে কুমকুমের জন্মভূমি কাশ্মীরের নামের উৎপত্তি। মধ্যান্তিকা নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু নাকি প্রথম এদেশে এর চাষ প্রবর্ত্তন করেন।

যাত্রীদের অনেকে মাঠে দাঁড়িয়েই চাষীদের কাছ থেকে জাফরান কিনতে চাইলেন, কিন্তু তারা জানাল যে মাঠের ফুলগুলি এখনও কাঁচা, তবে গত সনের ফসলের কিছু আছে বাড়ীতে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরলে আনতে পারে। বাস অতক্ষণ অপেক্ষা কোরতে রাজী না হওয়ায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হোল। জাফরান ছাড়াও বাকরখনি রুটী এবং উলের কাপড়ের জন্য পামপুরের প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীনগর থেকে ১৯ মাইল এসে বাস দাঁড়াল অবন্তীপুরের অর্দ্ধপ্রোথিত মন্দিরের কাছে। অতীতের কবর খুঁড়ে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে বিরাট মন্দির প্রাঙ্গণ; চারিধারে পাথরের প্রাচীর, সামনে মস্ত সিংহদ্বার, প্রাঙ্গণের মাঝ-খানে মন্দিরের উঁচু মণ্ডপ। কালের কালিতে পাথরগুলি কালো

অবন্তীপুরার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

(পৃঃ ১৪৭)

আচ্ছাবলের একাংশ (পৃঃ ১৪৮)

উদ্যানের অপরাংশ (পৃঃ ১৫০)

হোয়ে গেছে। সিংহদ্বার দিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে নামতে হয়, আবার প্রাঙ্গণ থেকে সিঁড়ি বেয়ে মাঝের মূল মন্দিরে উঠতে হয়। মূর্ত্তিদ্বেষী মুসলমান বাদশাদের আমলে এখানের মূর্ত্তি ও মন্দির বিনষ্ট হোয়েছিল, এমন ব্যাপক বিধ্বংস যে মন্দিরের বা প্রাচীরের গায়ের কোন মূর্ত্তিই আজ অক্ষত নাই এবং অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন। শ্রীনগরের লালমণ্ডির যাত্নঘরে রক্ষিত এখানের প্রায় প্রতিটী মূর্ত্তি বিধর্ম্মীর বিদ্বেষের বিষ-চিহ্ন বহন কোরছে। মন্দিরটীর যে অংশগুলি ভাঙ্গা সম্ভব হয় নাই সেগুলিই শুধু আজ দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা অবন্তীবর্ম্মা (৮৫৫—৮৮৩ খৃঃ অঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন অবন্তীস্বামী বিষ্ণুমূর্ত্তির জন্যে; তখন এ জায়গার নাম ছিল বিশ্বয়িকা-সর (Vishvaika-sara)। সিংহাসনে আরোহণের পর এর চেয়ে আরও বড় একটী মন্দির অবন্তীশ্বর শিবের জন্য নির্ম্মাণ করান জোবার গ্রামের কাছে। হাজার বছর পরেও হিন্দু-স্থাপত্য কৌশলের কাহিনী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সব বিরাট শিলা সাক্ষ্য। বাস খানাবল থেকে বানিহালের পথ ছেড়ে অনন্তনাগের বা ইসলামবাদের দিকে চোল্ল।

অনন্তনাগ কাশ্মীর উপত্যকার দ্বিতীয় নগরী। এখানে একটী ঝরণা ও জলকুণ্ড আছে, তারই নাম অনন্তনাগ। "নাগের" প্রাধান্য কাশ্মীরে খুব; ভেরীনাগ, অনন্তনাগ শেষ-নাগ; কোকরনাগ—এ নাগের অর্থ ঝরণাই হোক আর

সাপই হোক। পাতালের যে অনন্তনাগ—তারই আবাস এখানের এই জলকুণ্ডে—এই এখানের বিশ্বাস। স্বর্গের সব দেবতাই নাকি কাশ্মীরে আছেন—নানা নদ নদী, ঝরণা পাহাড়ের রূপ ধোরে, তাই এদের অধিকাংশেরই নাম হিন্দু দেব দেবীর অনুসরণে—হরমুখ, মহাদেব, কৈলাস, ভৈরব প্রভৃতি পর্ব্বত, গঙ্গাবল, মানসবল, শেষনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি হ্রদ, কিসেন-গঙ্গা, বিষেণসর, কিষণসর, অমরগঙ্গা প্রভৃতি নদী। কয়েক মাস আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অনন্তনাগের অধিকাংশ বাড়ী পুড়ে যায়। সরকার প্রজাদের গৃহনির্ম্মাণে কাঠ ও ঋণ দিয়ে সাহায্য কোরেছেন শুনলাম। নূতন বাড়ীঘর নানাদিকে তৈরী হচ্ছে। এটি মুসলমানদেরও তীর্থস্থান; অনেকগুলি জিয়ারৎ আছে। অনন্তনাগের কাছেই একটি গন্ধকের কুণ্ড আছে। আখরোট কাঠের শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প (Paper machine) প্রভৃতির জন্যেও অনন্তনাগের খ্যাতি আছে। পুরাতন ও ব্যবহৃত কম্বল ও লুই প্রভৃতির ওপর মোটামুটি সূচি শিল্পের সাহায্যে যে কাশ্মীরী 'গাববা' তৈরী হয় অনন্তনাগ তার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র।

অনন্তনাগ থেকে বাস আরও ১৭ মাইল এসে কোকোরনাগ পৌছল। পাহাড়ের কোলে একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণা এবং আসে পাশে নির্জ্জন সমতলভূমি ছাড়া এখানে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। শ্রীনগরের কাছাকাছি যাঁরা নির্জ্জনে পাহাড়ী আবহাওয়ায়

ঝরণার ধারে তাঁবুতে বাসের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কোরতে চান—এ জায়গাটি তাঁদের পক্ষে ভাল। কোকরনাগ, আচ্ছাবল, ভেরীনাগ মৎস্য শীকারীদের প্রিয়। এখান থেকে ভেরীনাগ ৮ মাইল। শ্রীনগরে আসার পথে যাঁদের ভেরীনাগ দেখা সম্ভব হবে না তাঁরা অনন্তনাগকে কেন্দ্র কোরে ভেরীনাগ, আচ্ছাবল উদ্যান, কোকরনাগ, আহরবল জলপ্রপাত এবং মার্ত্তণ্ডের মন্দির দেখতে পারেন। শ্রীনগর থেকে এ জায়গাগুলি বেশী দূর পড়ে। অনন্তনাগে থাকবার হোটেল ও ধর্ম্মশালা আছে শুনলাম।

কোকরনাগ থেকে অনন্তনাগ ফেরার পথে আচ্ছাবল গ্রামে বাস থামলো একেবারে এখানের মোগল উদ্যানের ফটকের সামনে। ইতিপূর্ব্বে যখন কাশ্মীর আসি, এ বাগানটি দেখা হয় নাই, তবে ধারণা ছিল নিশাদ ও শালিমার দেখার পর এটি দেখার তেমন প্রয়োজন নাই; কারণ রাজধানী থেকে অনেক দূরে বোলে এটি নিশ্চয়ই অযত্নরক্ষিত। কিন্তু ভেতরে ঢুকে বিস্মিত হোলাম এর সৌন্দর্য্যে। হেমন্তের হিমস্পর্শে উদ্যানটির অপরূপ শ্রী যে অনেকখানি ম্লান হোয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা গেলেও—বাগানটি তখনও বিগত-যৌবনা নয়; যৌবনের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট সুষমা তার দেহের প্রতি রেখায় রেখায় যাই যাই কোরেও যেন রোয়ে গেছে।

বাগানের বাইরে বড় বড় বুড়ো চেনার গাছ। বয়স হোয়েছে

বোল্লে বুড়ো বোল্লাম; বুড়ো বলেই বেরসিক নয়, বড় বড় পাতায় সবুজ রস কস্ কস্ কোরছে। বাগানটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং এ অঞ্চলের মোগল আমলের সব পাহাড়ী বাগানের মত কয়েকটি চত্বরে বিভক্ত। পেছনের বিরাট বপু পাহাড়টির কোল থেকে বাগানটি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। পাহাড়ের কঠিন পাথরের কোল থেকে অফুরন্ত ধারায় বেরিয়ে আসছে নির্ম্মল নির্ঝরণী। সেই জলধারাকে বাগানটার মাঝ ও তু'পাশ দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হোয়েছে। মাঝের জলধারাটি বিভিন্ন চত্বরের মাঝের বড় বড় অগভীর চৌবাচ্চাগুলিতে ফোয়ারার আকারে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবার নীচের চত্বরে নেমে যাচ্ছে। মধ্য নালাটির তুধারে রং বেরং এর ফুলের কেয়ারী, তারপর সবুজ ঘাসের সমতল চত্বর; তার মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণের ফুলের মালঞ্চগুলি; ঠিক যেন কারুকার্য্য করা কয়েকখানি কাশ্মীরী কার্পেট বিছান আছে বাগানখানির বুক জুড়ে।

সকলেই এখানে তুপুরের আহার সেরে নিলেন। গ্রামে কোন ভাল হোটেল্ নাই, কাজেই খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। চায়ের সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম কিন্তু খাবার ছিল না। মালীদের কয়েকজন চেনার পাতায় কয়েকটা আখরোট ভেঙ্গে উপহার দিলে। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করায় বোল্লে বাজারে ডিমের ওমলেট ও কেক পাওয়া যাবে।

একটা টাকা দিতে সে কিছুক্ষণ পর যা নিয়ে এল তাকে সুখাদ্য বলা চলে না; এজন্যে শ্রীনগর থেকে আহার্য্য সঙ্গে নেওয়া ভাল। বাগানে ফুল তোলা নিষিদ্ধ, কিন্তু মালীর দল সব বিদেশী যাত্রীদিগকেই বেশ মুক্তহস্তে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছিল—যাত্রীরা কিন্তু বখশিসে সে পরিমাণে মুক্তহস্ত ছিলেন না। অবশ্য মালীদের এটা পোড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। বাগানটি ঢুকে ডানদিকের দেওয়ালের মাঝামাঝি আছে একটা ভাঙ্গা "হামাম" বা স্নানঘর। জাহাঙ্গীর নাকি এটি তৈরী করান। ওপর থেকে ঠাণ্ডা জলস্রোতকে মাটির নলের সাহায্যে দেওয়ালের মাঝ দিয়ে এই স্নানঘরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছে। এটি একখানি ঘর নয়, অনেকগুলি ঘরের সমষ্টি। এক ঘরে নীচে কাঠ জ্বালিয়ে জল গরম করার ব্যবস্থা আছে, অন্য ঘর থেকে আসছে ঠাণ্ডা জল; দুটি ধারা এসে স্নানের চৌবাচ্চায় মিলেছে, প্রয়োজন মত ঠাণ্ডা ও গরম জল বাদশা ও বেগমরা এখানে মিশিয়ে নিতেন। ঘরগুলিও আবশ্যকমত গরম করা যেত। এখন অবশ্য শুধু এর কঙ্কালখানি দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের মালীরাই কিছু বখশিসের আশায় এগুলি দেখায়, তারা সঙ্গে না থাকলে ঢুকতে ভয় হয় এমনি জীর্ণ এর অবস্থা। বিদেশীর দাক্ষিণ্য এদের দারিদ্র্যকে কিছু লাঘব করে। তাছাড়া এরা প্রসন্ন হোলে বাগানের ফোয়ারাগুলির জলের উচ্চতা ৪।৫ ফিট থেকে ১৭।১৮ ফিট হোতে পারে। পাহাড়ের কোলের মূল

ধারাটির জল সামান্য কয়েকখানা কাঠ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ; এরাই জানে তার কৌশল। বাগানের মধ্যের কয়েকটি প্রাচীন চেনার গাছকে আকবরের আমলের বোল্লে, বৃক্ষতত্ত্ববিদরাই বোলতে পারবেন এর সত্যতা। সমগ্রভাবে বাগানটি চমৎকার। নিশাদ বা শালিমারের চেয়ে আয়তনে ছোট, কিন্তু সৌন্দর্য্যে খাটো নয়।

বাগানটির ওপরেই সরকারি ট্রাউট মাছ পালন-কেন্দ্র। স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন ধারাকে ছোট ছোট অনেকগুলি নালার মধ্যে দিয়ে চালান হোয়েছে। নালাগুলির ওপর জাল দেওয়া, মুখগুলিতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথক পৃথক নালায় রাখা আছে। সাধারণতঃ ৪।৫ বৎসর বয়স হোলে এগুলি বিক্রী করা হয়। অক্টোবরে ডিম পাড়ে বোলে বিক্রী বন্ধ থাকে। বিক্রীর বাধা দর বিজ্ঞপ্তির বোর্ডে লেখা থাকে। দর্শকরা গেলে পরিচারকের দল কিছু কিছু খাবার দিয়ে মাছের খেলা দেখায়, যদিও বিজ্ঞাপন দিয়ে এটা নিষেধ করা আছে। নালাগুলি অগভীর, জল স্বচ্ছ—কাজেই জলের ভেতরে সঞ্চরণশীল মাছগুলিকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। এদের বর্ণভেদ জাতিভেদ আছে ; কোনটা কালো, কোনটা সোনালী, কোনটা ডোরাকাটা। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী হারওয়ানেও ট্রাউট মাছের পালন কেন্দ্র আছে, কিন্তু সেখানকার আয়তন সংকীর্ণ এবং ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই মাছগুলির আদি নিবাস স্কটল্যাণ্ড।

জলের মধ্যে জাল ঢাকা ট্রাউট মাছ

(পৃ: ১৫০)
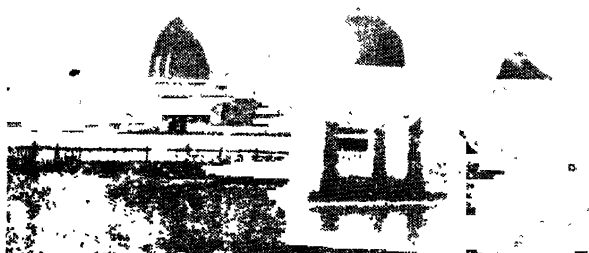
মাটনের সূর্য্যকুণ্ড ও মন্দির (পৃঃ ১৫২)

পহলগাম (পৃঃ ১৫৪)

মৎস্যাশী সাহেবলোক কাশ্মীরের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে এখানে এদের আবাসের ব্যবস্থা কোরেছে, ক্রমে এই সব প্রবাসীরা এখানের আদিবাসীতে পরিণত হোয়েছে। বদ্ধ জলে এরা বাঁচে না, বহমান স্রোতেই এদের জীবন, ঠাণ্ডা প্রয়োজন কিন্তু বরফ সইতে পারে না। এরা মাংসাশী জীব, ছোট ছোট মাছ এদের খাদ্য। এই সব কারণে এদের নাম ও দাম দুই ই বেশী, খানদানী খানা হিসাবেও এদের খুব খ্যাতি।

আচ্ছাবলে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আবার বাস অনন্তনাগ হোয়ে পহলগামের রাস্তায় চোল্ল। অনন্তনাগ থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে পাহাড়ের অধিত্যকার ওপর আছে মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাহাড়ে উঠে এটা দেখতে হয়, তার মত সময় হাতে না থাকায় এ মন্দিরটি দেখা এ যাত্রার সামিল নয়। পূর্ব্ববারে আমি এটি দেখেছিলাম। কাশ্মীরের অতীত স্থাপত্যকলার পরিচয় পেতে হোলে মার্ত্তণ্ডের মন্দির অবশ্য দ্রষ্টব্য। এত বড় মন্দির কাশ্মীরে আর একটিও নাই; এর প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ ২২০ ফিট ও প্রস্থ ১৪২ ফিট। প্রাঙ্গণের মাঝে মন্দির, চারধারে অলিন্দের পাথরের খিলানের কয়েকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ৮৪ টি পাথরের প্রকাণ্ড থামের ওপর মন্দিরের ছাদ। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস সম্রাট ললিতাদিত্য এর প্রতিষ্ঠাতা এবং এটি সূর্য্যদেবের মন্দির। কানিংহাম বলেন মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তিই ছিলেন; এবং এখানে জ্যোতিষ-গবেষণাগার ছিল। হয়ত

সেই জন্যেই এর নাম মুখে মুখে দাঁড়ায় মার্ত্তণ্ডের মন্দির—কারণ সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র কোরেই গ্রহ নক্ষত্রের গণনা চোলতো এখানে। ঐতিহাসিকেরা বলেন এ মন্দির ললিতাদিত্যের বহু পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা রামাদিত্য এবং তাঁর স্ত্রী অমৃতপ্রভার নির্ম্মিত ; পরে ৮ম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য এর সংস্কার করেন। এই বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেড় হাজার বছর আগে-কার হিন্দুস্থাপত্য শিল্প এবং কারুকার্য্যের যে গৌরব-স্মৃতি বহন কোরে আসছে তা দর্শককে বিস্মিত করে।

বাস এসে দাঁড়াল ভাওয়ানে বা মাটনে। ইতিপূর্ব্বে যখন এখানে আসি এখানের বর্ত্তমান মার্ত্তণ্ডের মন্দির দেখি নাই। পাহাড়ের কোলেই মার্ত্তণ্ডের মর্ম্মর মন্দির তৈরী করিয়েছেন মহারাজ হরি সিংহ। মন্দিরটি তেমন বড় না হলেও দেখতে ভাল। মন্দিরের পেছন থেকে আচ্ছাবলের মতই অবিরাম ধারায় জল বেরিয়ে এসে সামনের একটি প্রকাণ্ড সরোবরে সঞ্চিত হোয়ে, তার থেকে আবার একটী ধারায় প্রাঙ্গণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ; পাণ্ডারা বলেন এই স্রোতধারা অমরনাথ গুহার নীচের অমর-গঙ্গা থেকে আসছে। সরোবরের মাঝেও একটী মার্ব্বেলের ,মন্দির—বোধহয় শোভার জন্যে এই সরোবরের বা মচ্ছিকুণ্ডের মত স্বচ্ছ জল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। কাঁচের ধারের মত জল বোলে যে একটা উপমা আছে, এখানে এলে বোঝা যায় উপমাটা কত বাস্তব। কাঁচের ধারের যে গভীর সবুজ রং এখানের

কুণ্ডের গভীর জলের রং ঠিক তেমনি; মচ্ছিকুণ্ডে অসংখ্য মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ এরা অবধ্য। মন্দিরে মার্বেল পাথরের সূর্য্যমূর্ত্তিটী বেশ সুন্দর। মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা আছে; পাণ্ডারাও যাত্রীদের নিজেদের বাড়ীতে আশ্রয় দেন এবং এখানে পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠলে এখান থেকে মার্ত্তণ্ডের সূর্য্য মন্দিরও দেখার সুবিধা হয় আর কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পারিবারিক আচার ব্যবহার এবং এদেশী নিজস্ব খাবারের যথা—গুচ্ছি, করমশাক্ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়। অনেকে মন্দিরের সামনের বড় চীনার বাগানটীতে তাঁবু ফেলে কিছু সময় এখানে কাটান। ভাওয়ান থেকে এক মাইল দূরে 'বুমজু'তে (আজকাল সরকারী পুস্তিকায় লেখে Bhaumajo) কয়েকটী গুহামন্দির আছে; এর মধ্যে একটী গুহা বেশ বড় (২০০ ফিটেরও বেশী লম্বা), ভেতরে অনেকখানি যাওয়া যায়। গুহাগুলি ক্রমশঃ সরু হোয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। এর একটীর মুখের কাছে এক তপস্বীর কঙ্কাল এখনও পড়ে আছে। কঠিন তপস্যায় তিনি রক্তমাংসের দেহ ছেড়ে চোলে গেছেন, হাড় ক'খানি আজও পড়ে আছে। এই গুহামন্দিরগুলিও পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে সৃষ্ট। বিস্তৃত লিদার উপত্যকার শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি এখান থেকে চমৎকার দেখায়।

মার্টন থেকে পহলগামের দিকে চোল্লাম। ধানের ক্ষেত,

পাহাড় নদী ছাড়িয়ে ক্রমে একটি নদীর তীর ধোরে দু'টী উঁচু পাথুরে পাহাড়ের মাঝে লিদার উপত্যকায় ঢুকলাম। এই নদী থেকে একটী জলপ্রণালী পাহাড়ের গা দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হোয়েছে সেচনের জন্যে। পথে আইসমোকাম, বাটকোট, গণেশগাঁও প্রভৃতি কয়েকটী বড় গ্রাম পোড়ল। গণেশগাঁওএর কাছে একটী বিরাট গণেশ মূর্ত্তি ও কাশ্মীরের জনৈক ঋষি 'জনকের' মন্দির আছে। বাটকোটে মুসলমান মালিকগণ অর্থাৎ প্রধানেরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অমরনাথের যাত্রার সময় ভোগ সরবরাহ কোরে থাকেন।

শ্রাবণের চতুর্থী তিথিতে শ্রীনগর থেকে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে অমরনাথের পতাকা নিয়ে শোভা যাত্রা সুরু হয়। প্রথম রাত্রি পামপুরে, দ্বিতীয় রাত্রি বৈজবেরা, তৃতীয় রাত্রি মাটনে কাটিয়ে নবমীর দিন আইসমোকাম হোয়ে দশমীতে পহলগামে পৌছায়। তবে ইদানীং যাত্রীদের অধিকাংশই শ্রীনগর থেকে 'অমরনাথ যাত্রার' সঙ্গে না এসে, পহলগাম পর্য্যন্ত বাসে এসে সেখান থেকে 'অমরনাথ যাত্রার' সঙ্গে যোগ দেন। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকখানি এসে ক্রমে বিস্তৃততর একটা উপত্যকায় এলাম, তার পরই পহলগামের বাড়ীগুলি চোখে পোড়ল। একটা হোটেলের সামনে বাস দাঁড়াল। পহলগামের তখন ভাঙ্গা হাট; শীতের বরফান হাওয়ায় যাত্রীরা হাওয়া কেটেছেন, কাজেই দোকানদার হোটেলওয়ালাদের প্রায় সবাই শ্রীনগর চোলে গেছে। অধিকাংশ দোকানই বন্ধ।

মাঝে মাঝে, দু' চারটে মুদিখানা কি দু' একটা পশমের জিনিষের দোকান তখনও আশায় ভর কোরে দরজা খুলে রেখেছে। মে থেকে সেপ্টেম্বর এখানের মরশুম, তবে অমরনাথ যাত্রার সময় আগষ্ট (শ্রাবণী পূর্ণিমা) মাসেই বিশেষ জমজমাট। আমাদের ধারণা ছিল অমরনাথ দর্শনের দিন বৎসরে মাত্র একদিন—শ্রাবণী পূর্ণিমা ; কারণ আমরা যখন ১৯৩০ সালে এখানে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম একই দিনে যাত্রীরা পহলগান থেকে যাত্রা কোরে একই দিনে ফিরে এসেছিলেন। সঙ্গের দোকানপাট, সরকারী কর্ম্মচারী, ডাক্তারখানা সবই যাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া-আসা কোরেছিল। এবার শুনলাম শ্রাবণী পূর্ণিমা দর্শনের প্রশস্ত দিন বটে, কারণ ঐ দিন অমরনাথ লিঙ্গ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন এবং অমরনাথ 'যাত্রা' অমরনাথে পৌছায়, কিন্তু তার পূর্ব্বে বা পরে দর্শনের কোন বাধা নাই। জুন মাসে অথবা সেপ্টেম্বর মাসেও অমরনাথ দর্শন করা যায়, অবশ্য তখন যাত্রীর সংখ্যা কম কাজেই যাত্রার সব ব্যবস্থা নিজেদের কোরতে হয়, পথের দুর্গমতাও বেশী থাকে।

পহলগাম থেকেই অমরনাথ যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় ঘোড়া, কুলী, তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা কোরতে হয়, কাজেই অমরনাথ যাত্রার কাছাকাছি সময় পহলগাঁম সরগরম থাকে। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিজলী, মোটর, হোটেল এবং সহরের সব স্থবিধা সমন্বিত থাকায় বিদেশী বিলাসীদের কাছে গ্রীষ্মকালে এই পার্ব্বত্য সহরটি বেশ প্রিয়। এর উচ্চতা

৭২০০ ফিট। সহরের প্রায় এক মাইল আগে (অমরনাথের দিকে) দু'টি নদী এসে মিলেছে এবং পহলগামের নীচে দিয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে গেছে। একটি নদী (দুধগঙ্গা) আসছে অমরনাথের পথে শেষনাগ হ্রদ থেকে বেরিয়ে ; অপরটী কোলাহাই হিমবাহের তুষার থেকে। এই মিলিত নদী লিদর পহলগামের একটী বিশেষ আকর্ষণ, এর তীরে ছোট ছোট সমতল উপত্যকাগুলিতে বাগান, বাড়ী, স্নানের ঘাট ইত্যাদি আছে। এখানের সব বড় হোটেলগুলিই কয়েকদিন আগে বন্ধ হোয়েছে, দু'চারটী রেস্তোঁরা খোলা ছিল, তারই একটীতে বৈকালিক চা পান হোল। এখানের বিদ্যুৎ এখানের জলধারা থেকে উৎপন্ন হয়।

অমরনাথের পথে

পহলগাম থেকে একটী পথ গেল দুধগঙ্গার তীর ধোরে চন্দনওয়ারী (৮ মাইল, ৯৫০০ ফিট উঁচু) বায়ুযান (৯ মাইল, প্রায় ১৩০০০ ফিট) হোয়ে—১৪৭০০ ফিট মেহাগুনাস পথে চড়াই কোরে পঞ্চতরণী (৮ মাইল) এবং সেখান থেকে তুষারের ওপর দিয়ে কয়েক মাইল গিয়ে এবং সেখান থেকে কয়েক মাইল তুষারের ওপর দিয়ে অমরনাথ গুহা (৫ মাইল, পহলগাম থেকে ২৮ মাইল)। আর একটী পথ গেছে কোলা-হাই হিমবাহ (১৪০০০ ফিট) বা তুষারের অঞ্চল। কোলাহাই গিয়ে ফিরে আসতে প্রায় তিনদিন লাগে, আর অমরনাথ

পহলগামের একাংশ (পৃঃ ১৫৫)
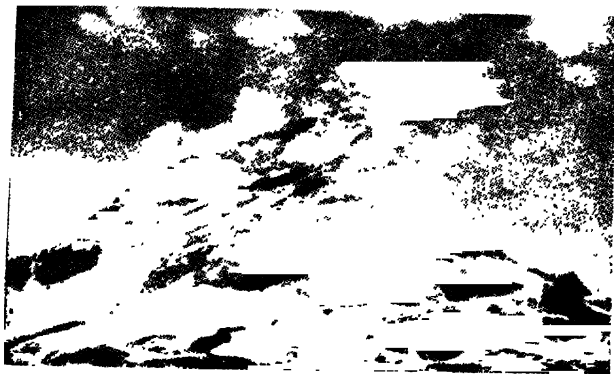
কোলাহাই শৃঙ্গ (পৃঃ ১৫৬)
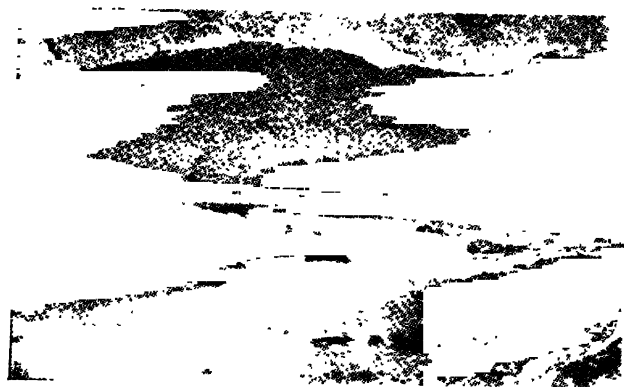
লিদার নদী (পৃঃ ১৫৬)

অমরনাথের পথের একাংশ (পৃঃ ১৫৮)

যাওয়া আসায় লাগে প্রায় ৫দিন। পহলগাম থেকে অমরনাথে যাত্রার পথে চড়াই আরম্ভের আগে যাত্রীরা প্রথম রাত্রি চন্দন-ওয়ারীতে কাটান; দ্বিতীয় রাত্রি বায়ুযানে; তৃতীয় রাত্রি পঞ্চ-তরণীতে কাটিয়ে অমরনাথ দর্শন সেরে ফিরে এসে রাত্রি কাটান বায়ুযানে এবং তার পরদিন পহলগামে ফিরে আসা যায়।

অমরনাথের পথে চন্দনওয়াড়ীর পর খাড়া চড়াই কোরে জজ্ঞপাল পাহাড়ের মাথায় এসে খানিকটা সমতল রাস্তা; তারপর কিছু এগিয়ে প্রায় হাজার ফিট নীচে চোখে পড়ে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা গভীর নীল শেষনাগ হ্রদ। সমুদ্র থেকে ১২৭৩০ ফিট উঁচুতে এই অপূর্ব্ব হ্রদটি (পহলগাম থেকে ১৫ মাইল)। জুন পর্য্যন্ত এর জল তুষারে আচ্ছন্ন থাকে, কাজেই জুলাই আগষ্টেও নীলজলের মাঝে মাঝে বরফের বহু টুকরো শ্বেত-রাজহংসের মত ভাসতে দেখা যায়। পাহাড়ের বেষ্টনীর এক ফাঁক দিয়ে এর জলধারা বেরিয়ে যাচ্ছে দুধগঙ্গা রূপে। যাঁরা পুণ্যকর্ম্মের কোন অঙ্গটী বাদ দিতে চান না, তাঁরা তীর থেকে হাজার ফিট নেমে সেই হিমশীতল জলে স্নান করেন। পাহাড় ঘেরা এমনি আরো কয়েকটী হ্রদ কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছে—কোনসার নাগ, গঙ্গাবল; তারসার, মারসার, (১২০০০ ফিট উঁচু) পানগং। ১২০০০ ফিট উঁচুতে কোনসারনাগ হ্রদেও গ্রীষ্মে তুষারের ভাসমান স্তূপ সমতলের অধিবাসীদের আনন্দে অভিভূত করে। শেষনাগের কাছ থেকেই কৈলাস পাহাড় (এ কৈলাস মানস

সরোবরের কাছে কৈলাস নয়) দেখা যায়। শেষনাগের পরই পাহাড়ের মাথায় উঁচু অধিত্যকায় বায়ুযান—এ যাত্রার মধ্যে কঠিনতম রাত্রি হোল বায়ুযানের। এই অধিত্যকাটীতে প্রায়ই খুব জোরে বায়ু চলে এবং তুষার ঝঞ্ঝাও এখানের স্বাভাবিক ঘটনা। কোনবার তুষার ঝঞ্ঝা বা তুষারপাত না হোলে যাত্রীদের সেটা বিশেষ সৌভাগ্য মনে কোরতে হবে। এই শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে ভেসেলিন, চা, কফি, বা কিছু ব্র্যাণ্ডিও রাখা ভাল এবং ভাল ওয়াটারপ্রুফে জিনিষ-পত্র ঢেকে রাখাও দরকার। রাত্রে হঠাৎ তুষার ঝঞ্ঝা সুরু হোলে নিরাশ্রয় সন্ন্যাসীর দল বা স্বল্পাশ্রয় যাত্রীরা প্রাণরক্ষার জন্যে অন্যের তাঁবুতে ঢুকে পড়েন—এমন ঘটনাও বিরল নয়। বায়ুযান থেকে ৮ মাইল এগিয়ে পঞ্চতরণীর পর কয়েক মাইল তুষারমণ্ডিত পথ। এই তুষারাবরণের অন্তরালে প্রবহমান পাঁচটী স্রোতধারা অদূরে এক হোয়ে মিশে হোয়েছে রামগঙ্গা। এ উপত্যকাটীর একদিকে ভৈরব ও অন্যদিকে কৈলাস পর্ব্বত। পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির নির্ম্মিত এক বিরাট গুহায় আছেন অমরনাথের তুষার লিঙ্গ এবং গণেশ ও পার্ব্বতীর তুষার মূর্ত্তি। অমরনাথের মূর্ত্তি যে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে কমে বাড়ে একথা জনৈক কাশ্মীরী কর্ম্মচারী—যিনি বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে গেছেন—বোল্লেন ; কাজেই এটী শুধু কিংবদন্তী নয়।

এখানের চারিদিকের পাহাড় প্রায় তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তবু এই কঠিন আবহাওয়ায় যে কি কোরে ছাই রংএর কয়েকটা পায়রা

উড়তে দেখা যায় এটা বিস্ময়ের বিষয়। অনেকে বলেন পাণ্ডারা এগুলি সঙ্গে নিয়ে যায়—সরল বিশ্বাসী যাত্রীদের ঠকাবার জন্যে; কিন্তু এমন একাধিক লোকের সঙ্গে দেখা হোয়েছে যাঁরা যাত্রার সময়ের ১৫।২০ দিন আগে বা পরে অমরনাথ গেছেন ও তাঁরাও এই পায়রা জোড়া দেখেছেন; কাজেই অবিশ্বাসী মন নিয়ে এখানে পায়রাগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চোলবে না। এই পায়রা যুগলের দর্শন না পেলে অমরনাথ যাত্রা সফল হয় না—ভক্তদের ধারণা। অমরনাথ সম্বন্ধে কাশ্মীরী পৌরাণিক কাহিনী এই—সকল দেবতারা অমরত্বের প্রার্থনা নিয়ে মহাদেবের কাছে এলেন। মহাদেব জটা নিংড়ে তাঁদের জন্যে যে জলধারা বের কোরলেন তাই হোল অমরাবতী নদী, আর তার কয়েক ফোঁটা এদিকে ওদিকে যা ছড়িয়ে পড়ল তাই থেকে এই পাহাড়ের ভেতর সৃষ্টি হোল মহাদেব, পার্ব্বতী আর গণেশের তুষার মূর্ত্তি। এই পায়রা জোড়ার উপাখ্যান হোল এই যে, একদিন মহাকালের কোলে মাথা রেখে পার্ব্বতী মহাদেবের মুখ থেকে শুনছিলেন অতি গুহ্য এক তন্ত্র। প্রহরায় ছিল রুদ্রের বিশ্বস্ত দুই গণ অর্থাৎ নন্দী ভৃঙ্গী। গুহ্য কথা শুনবার কৌতূহল দমন কোরতে না পেরে—নন্দীভৃঙ্গী আড়ি পেতে সেই গুহ্য কথা শুনছিল। মহাদেব তা জানতে পেরে ক্রোধে এদের শাপ দিয়ে পায়রা কোরে দিলেন। আর একটা প্রবাদ এই যে, মহাদেবের কোলে শুয়ে পার্ব্বতী এই গুহ্য

কথা শুনছিলেন আর হুঁ হুঁ কোরে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন; ক্রমে এক সময়ে দেবী ঘুমিয়ে পোড়লেন, কিন্তু ভোলানাথ আপন মনে বোলেই চোলেছেন। সেখানে ছিল দুই কপোত কপোতী, তারাও হরপার্ব্বতীর অজ্ঞাতে শুনছিল এই গুহ্য মৃত্যুনাশী তন্ত্র। সবটুকু শোনার লোভে পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে তারাই হুঁ বোলতে লাগলো এবং সব শুনলো। পরে মহাদেব দেখলেন পার্ব্বতী নিদ্রিতা, কিন্তু তখন এই কপোত কপোতী মরণজয়ী মন্ত্র শুনে অমর হয়ে গেছে। এরা নাকি অন্য সময় মানস সরোবরে থাকে, অমরনাথ পূজার সময় এখানে আসে। দক্ষিণভারতে চিঙ্গলপুটের কাছে পক্ষীতীর্থেও এমনি ধারা দুটী সোনালী চিল (কেউ বলেন ধুসর, আমার সোনালী ও গোলাপী মনে হয়েছিল।) বহুশতাব্দী ধোরে দৈনিক ভোগের সময় আসে। বেদের অনেক অংশ নাকি অমরনাথের গুহায় রচিত বোলে কথিত।

এখন পঞ্চতরণী থেকে সহজতর পথে অমরনাথ যাবার ব্যবস্থা হোয়েছে। পূর্ব্বে ভৈরব পাহাড় চড়াই কোরে—(১৩৫০০ ফিট) ভৈরোঘাট থেকে খাড়া দুর্গম উৎরাইএ নেমে অমরনাথ যেতে হোত। এই রাস্তায় পড়ে অমরাবতী বা অমরাওতী নদী।

অমরনাথের গুহাটী দক্ষিণমুখী; এর দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট, প্রস্থ ৪৫ ফিট, এবং মাঝের উচ্চতা ৪৫ ফিট। এ থেকে বোঝা যাবে এই স্বাভাবিক গুহাটীর বিরাটত্ব। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা ১২৭২৯

ফিট। প্রায় সমস্ত গুহাটীরই ছাদ থেকে অল্প সল্প জল চুঁইয়ে পড়ে; সেগুলি গিয়ে জমা হয় রামুকুণ্ড নামে একটী ছোট কুণ্ডে। গুহার ভেতরে অমরনাথ, পার্ব্বতী ও গনেশের তুষার মূর্ত্তি আছে।

ফেরার পথে অধিকাংশ যাত্রীই পূর্ব্বপথ ধোরে ফিরে আসেন; যাঁরা নূতনত্বের সন্ধানী তাঁরা কিছু কষ্টকর কিন্তু হ্রস্বতর পথ অষ্টানমার্গ দিয়ে চন্দনওয়ারী ফেরেন। পঞ্চতরণী থেকে ২ মাইল এসে এই পথটী ধোরতে হয়। এ পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও শুনেছি চমৎকার এবং চন্দনওয়াড়ী পর্য্যন্ত দূরত্ব ২ মাইল কম।

অমরনাথ যাবার আর একটী দুর্গমতর রাস্তা হোল সোনামার্গ উপত্যকা দিয়ে। সোনামার্গ থেকে বালটাল পর্য্যন্ত পায়ে-হাঁটা রাস্তা মোটামুটী ভাল (শ্রীনগর থেকে ৫৯ মাইল)। বালটালে একটি সরকারী রেষ্ট-হাউসও আছে; সেখানে রাত্রি কাটিয়ে ন' মাইল প্রায় তুষারাবৃত পথ পেরিয়ে সঙ্গম, সেখান থেকে আরও ৩ মাইল গেলে অমরনাথ। এ পথের অধিকাংশই তুষরাচ্ছন্ন বোলে খুব ভোরে যাত্রা সুরু করা দরকার। রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে পথ পিছল হয়। সোনামার্গের ঘোড়াওয়ালারা অক্টোবরেও আমাদের এ পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। একই দিনে বালটাল থেকে বেরিয়ে এই ১২ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে আবার রাত্রে বালটালে ফিরে আসতে হবে; এ ছাড়া পথে আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না। গ্রীষ্মে এ পথ আরও বিপজ্জনক, কারণ তখন পথের বরফ

আরও পিছল থাকে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে পা পিছলালে গন্তব্যে আর পৌঁছতে হবে না; পাশের পাহাড়ী খাদের অতলতলে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যেতে হবে। সেই প্রচণ্ড শীতে এবং দু'তিনটী কুলীর ওপর নির্ভর কোরে বালটাল হোয়ে অমরনাথ যেতে আমরা ভরসা করি নাই। পরে টুরিষ্টব্যুরোর কর্ম্মচারীরাও এই দুর্গম পথে না যাবারই পরামর্শ দেন।

হাজার হাজার যাত্রী ভারতের দূরদূরান্ত প্রদেশ থেকে প্রতি বছর আসেন এই তীর্থে। পথের পরিশ্রম, বায়ুযানের বায়ুব্যাত্যা, পঞ্চতরণীর কঠিন তুষার-পিছল পথ, গিরিপথের দুর্গমতা—সব উপেক্ষা করে, জীবন তুচ্ছ কোরে তাঁরা যান এই মহাতীর্থের মহাদেবকে দর্শন কোরতে। বড় জোর একঘণ্টা তাঁরা থাকেন এই প্রাকৃতিক মন্দিরে—কিন্তু তাদের অন্তরের আন্তরিক আকুতিতে আচ্ছন্ন হোয়ে থাকে এই পবিত্র গুহা। নবম শতাব্দীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এখানে এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অমরমাথ দর্শন কোরে (২রা আগষ্ট ১৮৯৮) বোলেছিলেন "এই তুষারলিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। এখানে চোর নাই, ব্যবসাদার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রে এত আনন্দ পাই নাই।" অমরনাথের দর্শন এই মহাযোগীকে কতদূর অভিভূত কোরেছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়। অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজী আরও কিছুদিন শ্রীনগরে বাস করেন। এখানে একটী মঠ ও সংস্কৃত অধ্যাপনার

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার তাঁর ইচ্ছা ছিল। মহারাজও এ বিষয়ে সাহায্য কোরতে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যে জায়গা পছন্দ করেন ইংরেজ রেসিডেণ্ট বার বার তা দিতে অস্বীকার করে। মহারাজ তিনবার চেষ্টা করেও এ বিষয়ে সার্থক হন নাই।

অমরনাথ দর্শনের কিছু পর থেকেই স্বামীজীর মন ক্রমশঃ শক্তিভাবে পূর্ণ হোতে থাকে। শ্রীনগরে মুসলমান মাঝির চার বছরের শিশু কন্যাকে তিনি উমারূপে পূজা কোরতেন। কাশ্মীরের শ্যামল শোভায় তিনি শ্যামার দর্শন পেতেন। শিষ্যদের একদিন বোললেন—"যে দিকেই ফিরি কেবল মাকেই দেখি। তিনি যেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধোরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।" এখানেই তিনি একদিন ভাবের ঘোরে Kali the Mother (মৃত্যুরূপা মাতা) কবিতাটী লেখেন। এ সময় প্রায়ই শিষ্যদের বোলতেন "তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা শুধু দয়াময়ী সুখ বিধায়িনি নন, তিনি ভীমা মৃত্যুরূপা, দুঃখদাত্রী রোগশোক সন্তানের জননী।" কখনও উপদেশ দিতেন "ভীমার উপাসনা দ্বারাই ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর, লোলরসনা করালীকে ধ্যান কর, মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান কোরে ফেল, তবে মার দেখা পাবি।" স্বামিজীর "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতায় ঠিক এই সুরই বেজে উঠেছে—

"সুখতরে সবাই কাতর, কে বা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্র সুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির উদগার, ভীম তরবার খসাইয়া দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্নে দেহে দয়া॥"
রাজতরঙ্গিনী এবং কাশ্মীরের প্রাচীন পুরাণ নীলমাতা-পুরাণে অমরনাথ যাত্রার অনেক কথা আছে।

কোলাহই ছাড়াও পহলগায়ের কাছাকাছি আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে অনেকেই যান। ২১ মাইল দূরে ১৩০০০ ফিট উঁচুতে তারসার হ্রদ, ১৪ মাইল দূরে ১০০০০ ফিট উঁচু মালভূমিতে লিদারওয়াট বনভূমি প্রভৃতি এদের মধ্যে প্রধান।

পহলগাম থেকে সন্ধ্যায় বাস ফিরলো শ্রীনগর। বর্ত্তমান যুগ গতির যুগ, কিন্তু এই গতিবেগের ফলে দেশভ্রমণের আনন্দ হোয়েছে ভিন্ন রকমের। পূর্ব্বে তীর্থে হাঁটা পথে চোলতে হোত, ৫০ মাইলের তীর্থ শেষ করে ফিরে আসতে হয়তো ১০ দিন লাগতো, কিন্তু পায়ে চলা পথের প্রতিটী জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হোত নিবিড়; পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে পাওয়া যেত যে পুণ্য তা ছিল প্রিয়তর, অনেক বেশী প্রাণবন্ত। আজ বেগবান বাসে দিন ৬০ মাইল কি ১০০ মাইল ঘুরে যে দর্শন বা তীর্থ ভ্রমণ হয় তার মধ্যে পায়ে চলার ঘনিষ্ট

পরিচয় নাই, পরিশ্রমের পারিশ্রমিকে পাওয়া প্রাণের স্পর্শ নাই, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

মোগল উদ্যান

বাসে একদিনে শ্রীনগরের সব মোগল বাগানগুলি দেখলে, আর শীকারায় ধীরে সুস্থে ২।৩ দিনে বাগানগুলি দেখলে, বোঝা যায় দু'ভাবে দেখার পার্থক্য। বাসে ৫।৬ ঘণ্টায় হারওয়ান, শালিমার নিষাদবাগ দেখিয়ে শেষে আনে চশমাসাহী বাগানে, যেটা শহরের সবচেয়ে সন্নিকট। আর শীকারায় গেলে একদিনে শালিমার নিষাদ দেখা যায়, অন্য দিনে চশমাসাহী, গাগরীবল এবং এর কাছাকাছি নূতন তৈরী বিজলী বাতির মালায় ঝলমল নৌকা রাখার দ্বীপ— "নেহেরু পার্ক"। হাতে সময় বেশী থাকলে আরও ধীরে সুস্থে এক একদিনে একটা বাগান এবং নাসিমবাগ, নাগিনবাগ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। বেড়ানর বিলাস ঠিকমত উপভোগ কোরতে চাইলে একটু সময় হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে সব দেখা ভাল। অনেকে ১৫।১৬ দিনের জন্যে কাশ্মীর গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পরে বোলেছিলেন যে সব দেখার জন্য রোজ দৌড়াদৌড়ি কোরে (অবশ্য বাসে) তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেছেন; অবসর বিনোদের বিলাস, বিশ্রাম ও আনন্দ একটুও পান নাই।

শ্রীনগর বা ডালগেট থেকে শীকারায় বাগানগুলি যাবার অনেক জলপথ আছে, তার মধ্যে সাধারণতঃ শীকারা রাইনাওয়াড়ী

রাইনাওয়াড়ীর পথে (পৃঃ ১৬৬)

চোলছিল—দুধারে মাঝে মাঝে চোখে পোড়ছিল কাশ্মীর কন্যাদের, কেউ বাসন মাজছে, কেউ কাপড় কাচছে। এদের দেখে মনে পোড়ল এই গ্রামেরই একটী বধূকে—তার নাম আরনিমল। মেয়েটি ছিল এই গ্রামের বিখ্যাত ফরাসী কবিতা লেখক মুন্সি ভবানীদাস কাচরুর স্ত্রী। আরনিমল জন্মেছিল সতের দশকের শেষের দিকে শ্রীনগরের সহুরে আবহাওয়ায়, কিন্তু বিয়ে হোল তখনকার এই গ্রামে। আরনিমল ছিল স্বভাব কবি; কিন্তু এই কবির কাব্য-গগনে চাঁদ হাসলো না, ফুল ফুটলো না। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে এই কোমল কবিপ্রাণে লাগল কঠিন আঘাত—সেই আঘাতই রূপ নিল আরনিমলের 'লোক সঙ্গীতে'। আরনিমলের কবি প্রতিভা কাশ্মীরী সাহিত্যে স্বীকৃত। লালেশ্বরীর মত তাঁর কবিতায় ধর্ম্ম বা দর্শনের ইঙ্গিত নাই। ইনি বিরহিনী কবি, মাটীর মানুষ, মানুষের মর্ম্মবেদনায় এঁর দরদী মন তাই কেঁদেছে। বিরহে এঁর জীবন ব্যর্থ, তবু তাঁর দীর্ঘশ্বাস অভিশাপ হোয়ে ওঠে নাই। এই কল্যাণময়ী কবি কারু অকল্যাণ কামনা কোরতে পারেন নাই; তার জীবনের ব্যর্থতা বিষ হয়ে ফুটে ওঠেনি।

আরনিমলের কবিতার মর্ম্ম এই ঃ—

বঁধু, কাহারে কহিব এ মরম ব্যাথা,
সকলে আমায় উপহাসে; সে যে কয়না কথা।
তবু তার সুখে আমি সুখী;
হই আমি চিরদুঃখী।

গৃহ ছেড়ে এসেছিলাম শুধু তার তরে,
কিন্তু তবু ক্রুদ্ধ চোখে ছুঁড়ে দিল মোরে ;
তবু সে সুখে থাক, দীর্ঘ জীবন পাক।
ক্ষতি নাই, আমি হই দুঃখী।
এই আশা করি।

আরনিমলের কবিতায় তার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতাই নানা ছন্দে রূপ নিয়েছে। কাশ্মীরের বসন্তের অপরূপ রূপ তার কবিতায় ফুটে উঠেছে অথচ তার সঙ্গে বেজেছে বিরহীর মর্ম্মবীণা।

কাশ্মীরের কাব্য ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছে এই সব কবির রচনায়। আজও কাশ্মীরের সাহিত্য খুব বেশী পেছিয়ে নাই ; সংস্কৃত, পারসিক এবং উর্দ্দু ভাষার ঐতিহ্য ভিত্তি কোরে আজ কাশ্মীরের নিজস্ব যে কথ্য ভাষা গোড়ে উঠেছে—সেই ভাষাতেই আজ কাশ্মীরী সাহিত্য সৃষ্ট হোচ্ছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রেম ও বিরহের যে রাগিণী সঙ্গীতে রণিত হোত আজকের কাশ্মীরী কবিতায় তার লেশমাত্র নাই। আজকের কবি গায় বঞ্চিতের বেদনা, সে সৃষ্টি করে রাজনৈতিক চেতনা ; কল্পনালোক থেকে সে আজ নেমে এসেছে কঠোর বাস্তব লোকে। বর্ত্তমানকালের বিদ্রোহী কবিদের মধ্যে গোলাম আহমদ্ মাহজুর, আবদুল আহাদ আজাদ, মীর্জ্জা গোলাম হাসান বেগ (ছদ্মনাম আরিফ), আবদুল সাত্তার গুজরী (ছদ্মনাম আসি অর্থাৎ পাপী), দীননাথ (ছদ্মনাম নাদীম) প্রেমনাথ পরদেশী, সোমনাথ জুটসী প্রভৃতির নাম

উল্লেখযোগ্য। ভক্তিমূলক কাব্য রচয়িতা হিসেবে দয়ারাম গাঞ্জু, জিনদা কাউল সুখ্যাতির সঙ্গে পুরাতন ধারাকে আজও জীবিত রেখেছেন। কাশ্মীরী কথ্যভাষায় রচিত দুটি প্রাচীন রূপকথার বই 'ওয়াজীরমল' ও 'লালমল'। প্রেমের কাহিনী আছে 'শা সায়ার' এ এবং 'শাশমান'-এ আছে বহু দুর্দ্ধর্ষ ঠগ দস্যুদের কাহিনী। এসব নিজস্ব সাহিত্য ছাড়াও আরবের গল্প 'হাতেম তাই' পারস্যের 'সোহরাব-রুস্তম' 'ইয়ুসুফজুলেখা,' 'শাহনামা' প্রভৃতি অনেক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান কাশ্মীর সাহিত্য আপন কোরে নিয়েছে। 'কথা-সরিৎ-সাগরের' লেখক সোমদেব (১০০০ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরের অধিবাসী। সোমদেব ছাড়া আরও অনেক কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক, যথা—দামোদর গুপ্ত (৭৬০ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরী ছিলেন। রত্নাকর (৮৫০ খৃঃ অঃ) দোশোপদেশ লেখক ক্ষেমেন্দ্র (৯৭৫ খৃঃ অঃ) কাশ্মীরী ছিলেন। সাহিত্য ছাড়া দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও কাশ্মীর সন্তানদের অনেকে আজও স্মরণীয়। বিখ্যাত দার্শনিক পতঞ্জলি, আলঙ্কারিক বামন ভট্ট, চিকিৎসা-বিদ্ চরক, শুশ্রুত, নরহরি. জ্যোতির্বিদ্যায় আর্য্য ভট্ট, ভাস্করাচার্য্য সকলেই কাশ্মীরের সন্তান। কাজেই ঐতিহ্য, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি—সকল বিষয়েই কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ডালের কমলবন ছেড়ে ধীরে ধীরে কখন কাশ্মীর সাহিত্যের কমলবনে ঢুকে পোড়েছি—কিন্তু আর নয়।

এবার ফেরা যাক্ ডালের জলে, রানইওয়াড়ীর খাল যেখানে গিয়ে পোড়েছে ভাসা বাগানের মাঝে। শ্রীনগরের সব্জীর একটা বড় অংশ জন্মে এই সব ভাসমান ক্ষেতে। এগুলি ছাড়িয়েও প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর চোখে পোড়ল "নাগিন লেক"। এখানের স্বচ্ছ শান্ত জলে সাহেবদের আমলে নানা জলক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল—আজও দেশী সাহেবরা তাদের কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানেও হাউসবোটের একটী বড় আড্ডা আছে; সহর থেকে দূরে শান্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা অনেকেই এখানে থাকেন। ছোট খাট বাজার, হোটেল ও তাঁবু ফেলার ময়দান আছে— আর আছে একটী কুষ্ঠাশ্রম। বহুদিন পূর্ব্বে কোন দয়াময়ী ইংরেজ মহিলা এটী প্রতিষ্ঠা করেন। এখন রাজ্য-সরকার এর ভার নিয়েছেন।

নাগিনলেকের পর পড়ে হজরৎবল, শ্রীনগর থেকে প্রায় ৭ মাইল দূর। এটী মুসলমানদের একটী পরমপবিত্র তীর্থ, কারণ হজরৎ মহম্মদের কেশের কয়েক গাছি এখানের জিয়ারদগায় একটী সোনা-মোড়া শিশিতে রক্ষিত আছে। বছরের একটী বিশেষ দিনে এটী ভক্তদের দেখান হয়, তখন প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান এখানে জমায়েৎ হন। এ’ছাড়া প্রতি শুক্রবারের নমাজেও এখানের বিস্তীর্ণ প্রার্থনা প্রাঙ্গণে বহু ভক্ত যোগ দেন, কাজেই যাঁরা কাশ্মীরের বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের একত্রে দেখতে চান তাঁরা

শুক্রবার এখানে এলে ভাল কোরবেন। এখানের মসজিদও মুসলমানদের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

সন্নিকটেই নাসিমবাগ। এ বাগিচায় ফুলের কেয়ারী নাই, ফোয়ারার ফুলঝুরি নাই, শুধু আছে শত শত চেনারের ঘন পক্ষপুটের ছায়াতলে সমতল সবুজ ঘাসের মোটা কার্পেট। সামনেই ডালের স্বচ্ছ চিকণ জলে ফোটে অজস্র পদ্মফুল, তার ওপারে আকাশের কালজোড়া পাহাড়। শ্রীনগরের কাছে অথচ ডাল, শালিমার, নিশাদ প্রভৃতিও দূর নয় বোলে অনেক সৌন্দর্য্য-পিপাসু এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন।

এর পর ছোট্ট একটী দ্বীপ, তাতে কয়েকটা চেনার গাছ আর কিছু আগাছা। দ্বীপটীর নাম 'সোনালঙ্কা'। লম্বা ও চওড়ায় আন্দাজ ৪০ গজ। অনেকে এখানে নেমে খানিকটা সময় কাটান বা চড়িভাতিও করেন। ছুটীর আনন্দ উপভোগ করার পক্ষে কিংবা কবিত্বময় পরিবেশে প্রেমের মোহময় আবহাওয়া সৃষ্টির শক্তি সোনালঙ্কার আছে মনে হোল।

সোনালঙ্কার মায়া কাটিয়ে বিস্তীর্ণ ডালের বুকে আরও খাণিকক্ষণ পাড়ি দিয়ে একটী ছোট্ট খালে ঢুকলো শিকারা। খালটী অপরিসর, অগভীর এবং অপরিচ্ছন্ন—প্রায় মাইল খানেক লম্বা। এরই অপর মাথায় বাঁধান রাস্তার ওপর 'শালিমার বাগ'। শালিমার বাগের মাঝের নালার উদ্বৃত্ত

জল সোজা এই খালে পোড়ে ডালের জলে মিশে যায়। শ্রীনগর থেকে এর দূরত্ব ৯ মাইল।

শালিমার বাগ (বা সালামার বাগ) বা 'প্রেমকুঞ্জ' তৈরী করান সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রেয়সী নুরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য ১৬১৯ খৃঃ অব্দে। পাহাড়ের ঠিক কোলে না হলেও এর চারিদিকে পর্ব্বতের পরিবেশ। হারোয়ানের বিরাট জলাশয় থেকে আসে এখানের ফোয়ারায় জল, কাজেই বর্ত্তমানে তা পরিমিত। শুধু রবিবার ফোয়ারাগুলিতে জল ছাড়া হয় দর্শকদের জন্য—তাও একটু শীত পোড়লে জলাভাবের জন্য বন্ধ থাকে। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে এটী নির্ম্মিত, কাজেই কালের করাল স্পর্শে অতীতের অনেক সৌন্দর্য্যই আজ ক্ষীয়মান—তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা মনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। ডালের পূর্ব্ব কোণে মহাদেব পর্ব্বতের (৯০০০ ফিট্) প্রায় কোলে এই বাগানটী, পর পর চারটী ধাপে উঠে গেছে। দু'ধারে প্রবেশ পথ, আর তাদের মাঝ দিয়ে বাগানটীর জল ছোট্ট একটী জলপ্রপাতের আকারে বেরিয়ে সামনের খালে পড়ে। প্রতি চত্বরে সবুজ ঘাসের ওপর সৌরভ শূন্য বর্ণাঢ্য বিভিন্ন বিলাতী ফুল (সিজন্ ফ্লাওয়ার), মাঝে মাঝে সুষ্ঠুভাবে ছাঁটা ঝাউ জাতীয় গাছ। হঠাৎ ঢুকলে ভ্রম হয় বুঝি বহুমূল্য কাশ্মীরী কার্পেটে বাগানটী মোড়া। বাগানটী দৈর্ঘ্যে ৫৯০ গজ—প্রস্থে ২৪০ গজ—এই থেকেই বোঝা

শালিমার বাগ

(পৃঃ ১৭২)
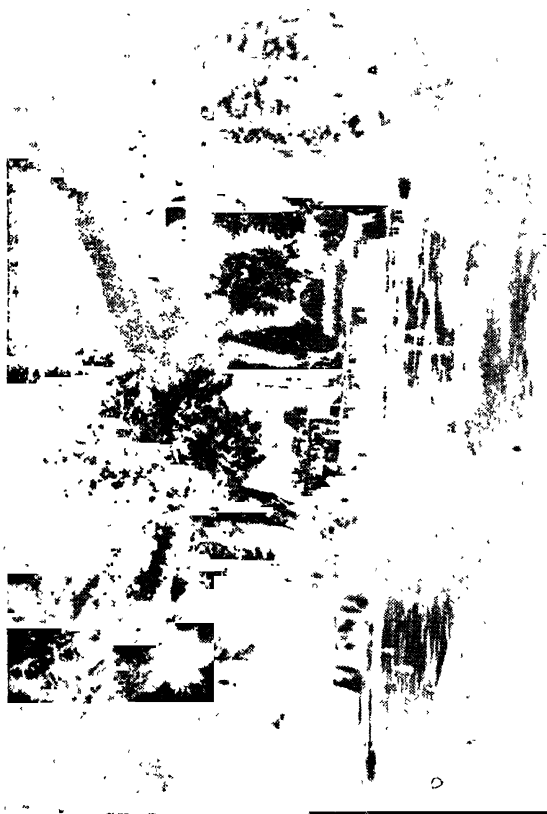
শালিমারের অপরাংশ (পৃঃ ১৭৩)
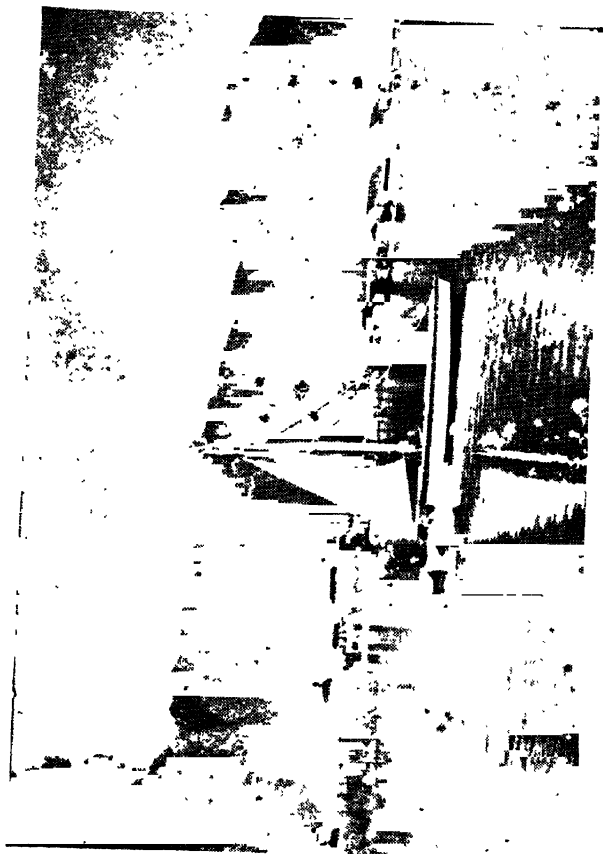
ডালের তীরে নাসিমবাগ ও নাগিন হ্রদ

(পৃঃ ১৭১)

দূর থেকে নাগিনবাগ (পৃঃ ১৭২

কিশোর মাঝি (পৃঃ ৬১)

যাবে এর বিশালত্ব। বাগানটীর তিনটী চত্বরের মাঝে তিনটী বিশ্রামাগার আছে—প্রথমটী থেকে জাহাঙ্গীর প্রজাদের দর্শন দিতেন, দ্বিতীয়টিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিভৃত আলাপ চোলত, আর তৃতীয় এবং বৃহত্তমটী নির্দ্দিষ্ট ছিল সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ও তাঁর সঙ্গিনীদের জন্যে। এই প্রমোদ ভবনটি (বার দোয়ারী) এক বিশেষ ধরণের কালো মার্ব্বেল পাথরের তৈরী, যার ঔজ্জল্য আজও অম্লান। এর ভেতরে যে সব চিত্রকলা ছিল তার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। এই প্রমোদশালার মাঝের কক্ষটী বেশ বড়, পাশের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মেঝের মসৃণতা আজ নাই, দরজায় নাই সোনালী জরীর কাজ করা মস্‌লিন পর্দ্দা, নাই নর্ত্তকীর নুপুর নিক্কণ অথবা কঙ্কণের কিঙ্কিণী, নাই ফেনিল পানপাত্রের রিনিঝিনি অথবা মদিরামত্তের উদ্দাম বিলাস বিহ্বলতা। তবু একটু কল্পনার সাহায্য নিলে এখানে বোসে মোগল যুগে ফিরে যেতে কষ্ট হয় না। এটীর চারদিকে দেড় শতটী ফোয়ারা থেকে উছলে উঠত হাজার হাজার জলকণা, আর চারদিকের চত্বরের ফুলের ফুলঝুরির মাঝ দিয়ে নাচতে নাচতে আসতো চারটি জল-ধারা। ফোয়ারা বসান অগভীর জলাধারের মাঝখানে এই প্রমোদ ভবন। এর দাওয়ায় হাজারো কুলঙ্গীর মধ্যে সন্ধ্যায় জ্বোলত অসংখ্য দীপ ; সে দীপের আলো প্রতিভাত হোত সামনের জলপ্রপাতে আর ফোয়ারা থেকে ফুন্‌কি দিয়ে ভেঙ্গে পড়া

লক্ষ লক্ষ জলকণায়। শত শত প্রদীপের কম্পমান উজ্জ্বল শিখা সৃষ্টি কোরত সহস্র ইন্দ্রধনু চারদিকের চলন্ত জলধারায় আর উছলে উঠা সহস্র জল কণায়। প্রদোষের স্তিমিত আলোয় এই বারদোয়ারীতে বোসে চারদিকের বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝে ফোয়ারাগুলির নৃত্যছন্দের একটানা সুরের ছন্দে অনায়াসেই নিজেকে কল্পলোকে হারিয়ে ফেলা যায়। এর মাঝেই হয়ত চঞ্চলা লঘুচারিণী মৃগনয়না মোগল মদালসাদের চাপল্য, চক্রান্ত, প্রেম, প্রতি-হিংসা সবই চোলত। শ্রেষ্ঠা সুন্দরী সম্রাট-মন-হারিণী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান শুধু বিলাসিনী শয্যাসঙ্গিনীই ছিলেন না, সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। যাক্ সে কথা। এই প্রমোদ ভবনের মেঝেয় দাঁড়ালে মনে হয় ডাল হ্রদ বুঝি বাগানটীর কোলেই। বাগানের সামনের এক মাইল লম্বা খালটী বাগানের মধ্য নালাটীর সঙ্গে এক সরল রেখায়। শালীমার বা শালীমারকে বর্ত্তমানে মরশুমের সময় রবিবারে বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত করা হয়। বাগানটীর ওপারে প্রাচীরের বাইরে শস্যক্ষেত্র ও আপেলের বাগান। অক্টোবরে এখানে প্রচুর আপেল।

শালিমারে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে আবার আমরা শীকারায় উঠলাম নিশাদবাগে যাবার জন্যে। যাদের সময় ও অর্থ আছে তাঁরা একদিন একটি কোরে বাগান দেখলে অনেক বেশী আরাম ও আনন্দ পাবেন। এক ঘণ্টায় দেখা হয়

তবে উপভোগ করা যায় না। শালিমার থেকে জলপথে নিশাদবাগ প্রায় দু'মাইল, স্থলপথে প্রায় দেড় মাইল। এই দু'মাইল পথ যেতে আমাদের বেশ সময় লাগলো, কারণ বিকেলের দিকে হ্রদের বুকে হাওয়া উঠলো। দুজন মাঝিতে দাঁড় টেনেও প্রতিকূল হাওয়ার বিরুদ্ধে শীকারাকে এগিয়ে নিতে বেগ পাচ্ছিল। নীচে গভীর জল—তার নীচে পানিফল ও অন্যান্য গাছপালা—এক ভিন্ন জগৎ। শান্ত জল হাওয়ায় অশান্ত হোয়ে উঠলো, ছোট ছোট ঢেউ শীকারার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ ভয় ধরিয়ে দিলে। পুরাতন আমলের একটি রাস্তার সেতুর নীচে দিয়ে শীকারা চোল্লো নিশাদবাগের দিকে। এই রাস্তাটি দিয়ে জলের এই অংশটিকে যেন বাঁধ দেওয়া হোয়েছে, কাজেই বাইরের অশান্ত আবহাওয়া এখানে অনেকটা শান্ত।

ডালের তীরে পাকারাস্তা, তার পরই নিশাদবাগের উঁচু প্রাচীর (প্রায় ১২ ফিট উঁচু)। ডালের তীর থেকে পর পর দশটি চত্বর উঠে গেছে পাহাড়ের কোলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় প্রতিটি চত্বরে। দ্বিতীয় চত্বরটিতে একটি কাঠের কারুকার্য্য করা দোতালা ঘর আছে। এখান থেকে বেগমরা বাগান ও ডালের সৌন্দর্য্য উপভোগ কোরতেন। এর প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে এক মালী—কিছু বখশিস্ দিলে (দু'চার আনা) সে দরজা খুলে দেয়। এর ওপর থেকে বাগানটির দৃশ্য সত্যিই অনুপম—অবর্ণনীয়।

নিশাদবাগ তৈরী করান জাহাঙ্গীরের শ্যালক এবং শাজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁ (১৬৪৫ খৃঃ অঃ)। শ্রীনগর থেকে জলপথে এর দূরত্ব ৬ মাইল, আর স্থলপথে প্রায় ৭½ মাইল। এর দৈর্ঘ্য ৫৯৫ গজ প্রস্থ ৩৬০ গজ, সমস্ত মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে এটিই বৃহত্তম। নিশাদবাগের অর্থ হোল—আনন্দ-উদ্যান, সেদিক থেকে এ উদ্যানটি সার্থক নামা। শালিমারের মত এর জল প্রণালী চার ধার থেকে আসছে না ; ওপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত বাগানটির মাঝে একটী জলপ্রণালী চত্বর থেকে চত্বরে নেমে চোলেছে ছোট বড় প্রপাতের আকারে। প্রতি চত্বরে জলপ্রণালীর মাঝে মাঝে ফোয়ারার শ্রেণী, দুধারে আবার থাকে থাকে নেমে গেছে ফুলের গালচে। দেওয়ালের ধারের চত্বরগুলিতে আপেল ও অন্যান্য ফলের গাছ। ফলে ফুলে ভরে আছে সমস্ত বাগানখানি, আর কলকল ছলছল কোরে মাঝ দিয়ে ছুটে চোলেছে নির্ঝ'রিণীর জলধারা। তারই বুকে লক্ষধারায় উছলে উঠছে ফোয়ারার ফুলঝুরী। এর চেয়ে সুন্দর কিছু বুঝি কল্পনা করা যায় না, সৃষ্টি করা ত দূরের কথা। যদিও অনেকে শালিমারকে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলেন, আঁমার কিন্তু নিশাদকেই ভাল লেগেছিল বেশী। বর্ত্তমানে শুধু রবিবারে অথবা বিশিষ্ট সরকারী উৎসবের দিনেই এর ফোয়ারাগুলিতে জল ছাড়া হয়। আমরা একদিন জলশূন্য অবস্থায় ও অন্যদিন সজল ফোয়ারা সমেত এর দৃশ্য দেখেছি, তফাৎ প্রায় আকাশ পাতাল।

নিশাদে নির্ঝরিণী

(পৃঃ ১৭৬)

নেহেরু পার্ক—শ্রীনগর

(পৃঃ ১৭৮)
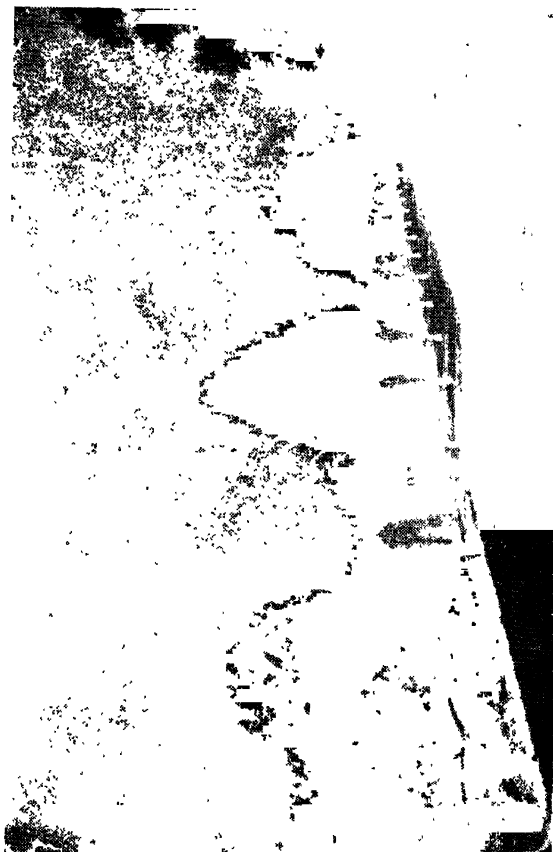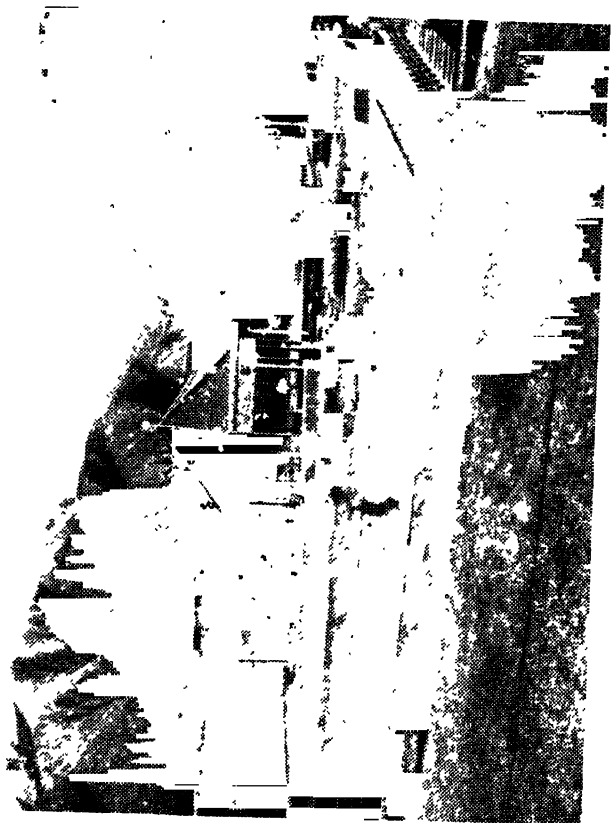
পাহাড়ের দিক থেকে নিশাদবাগ (পৃঃ ১৭৬)

'জেনানামহল' থেকে নিশাদবাগ (পৃঃ ১৭৫)

ডালের বুকে (পৃঃ ১৭৭)

কাশ্মীর

ডালের নিথর জলের মুকুর

(পৃঃ ১৭৭)

শালিমার উদ্যানের ফোয়ারা

(পৃঃ ১৭৪)

চশমাসাহীর প্রবেশ পথ (পৃঃ ১৮৩)

শালিমারের একাংশ (পৃ: ১৭৩)

জলের জৌলুষ নৃত্য-ছন্দ ও নিক্কণী বাদ দিলে বাগানটিকে নিরাভরণা সুন্দরী বিধবার মত দেখায়।

ফেরার পথে সন্ধ্যা হোল। ডালের বুকে অস্তগামী রবির লাল ও সোনালী আভা এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। দূরে পীরপঞ্জলের রজত-শুভ্র কিরীট শোভিত শীর্ষে অস্তগামী নিষ্প্রভ সূর্য্য যেন গলিত স্বর্ণ আর লাল আবীরের হোলিতে মাতামাতি করে আর পশ্চিমের আকাশ তার স্পর্শে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হোয়ে ওঠে। কোন অসীম শক্তিমান অদৃশ্য শিল্পী তাঁর কুশলী তুলিতে নীল আকাশের পটে অবিরত এঁকে চলেন অপূর্ব্ব বর্ণের সমন্বয়ে নানা দৃশ্য, আর তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় ডালের নিথর নির্ম্মল জলের মুকুরে। ডালের একধারে সরল পপলারের দীর্ঘ ছায়া, অন্য ধারের হরমুখ ও শঙ্করাচারিয়া পর্ব্বতের বিরাট বপুর ধ্যানগম্ভীর প্রতিচ্ছবি সে সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর কোরে তোলে; প্রদোষের স্বল্পালোক কল্পলোকের সৃষ্টি করে ডালের বুকে। নীচে গভীর জল, ওপরে অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টিমাধুর্য্য—পাহাড়, ঝর্ণা, পপলার, পদ্ম। এই বিরাট সৌন্দর্য্যের মাঝেই বুঝি যোগী বিবেকানন্দ মায়ের অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়েছিলেন। প্রেমিক, কবি, ভাবুক, এমন কি ঘোর বিষয়ীও এর মধ্যে এক অনাস্বাদিত-পূর্ণ আনন্দ পাবেন। আরও কিছুদিন আগে পূর্ণিমার রাত্রে অথবা জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায়—যখন চাঁদের মিষ্টি আলোয় সারা পরিবেশটা ঘিরে সৃষ্টি করে এক মায়ালোক, আকাশের

অগণিত তারা জলের ছোট ছোট ঢেউএ অসংখ্য মাণিকের মত ঝকমক করে—সেই অপরূপ অপরিসীম সৌন্দর্য্য-লীলার মধ্যে অনায়াসে অনুভব করা যায় বিশ্বস্রষ্টার অসীম শক্তির আভাষ। বসন্তে এর সঙ্গে যোগ দেয় অজস্র পদ্মের শোভা ও সৌরভ। আমরা শুধু পদ্মের পাতাগুলি দেখেছিলাম কিন্তু তেমন পদ্মের পরিবর্ত্তে পেয়েছিলাম পীরপঞ্জালের তুষারশুভ্র শিখরের সৌন্দর্য্য।

অন্ধকারের আবছায়ায় চোল্লাম 'চারচেনার' অথবা "রূপালঙ্কার' দিকে। সোণা-লঙ্কার মতই এটি আর একটি ছোট দ্বীপ। এর ওপরে চারধারে আছে চারটি বড় বড় চেনার গাছ, তাই এর চলতি নাম 'চারচেনার'। সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন আর কবুতরখানা ও চশমাসাহী বাগান যাওয়া সম্ভব হোল না। পদ্মপাতার বনের ভেতর দিয়ে শীকারা এল গাগরীবলে। এখানে আর একটি নতুন প্রমোদ উদ্যান তৈরী হোয়েছে বর্ত্তমান সরকারের আমলে; এর নামকরণ হোয়েছে নেহেরু পার্ক। আসলে এটি সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৌকা চালনা শিক্ষার কেন্দ্র। এর সামনের অংশটি একটি ছোট দ্বীপ, তার পেছনে একটি খালে নৌকাগুলি রাখা হয়। এই খালটির ওপর দোতলা বাড়ীতে শিক্ষার্থীদের বেশ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা, নৌকার সাজ সরঞ্জাম রাখার এবং আহারের বন্দোবস্ত আছে। ডালের জলে নৌকার বাইচ এখানের একটি দ্রষ্টব্যের মধ্যে। নৌকা রাখার খালটির অপর পারেও বেশ সমতল অনেকখানি জমি। হ্রদের জলের

দিকের দ্বীপটিই সযত্ন রক্ষিত। সমতল দ্বীপটি সবুজ ঘাসে ভরা; মাঝে রকমারী রংদার ফুলের কেয়ারী আর বাঁধান পায়ে চলা পথ, জলের ধারে রেলিং দেওয়া; মাঝে মাঝে বসবার বেঞ্চ। রাত্রে এর শোভা দ্বিগুণিত হয় যখন উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে এই ছোট সাজান দ্বীপটি এবং তার বুকের বিচিত্র বর্ণের আলোর মালাগুলি প্রতিবিম্বিত হয় চারপাশের গভীর কালো জলের আয়নায়। বহু বিদেশী এবং কাশ্মীরবাসী সন্ধ্যায় ডালের বুকে শঙ্করাচারিয়ার পাদমূলে আধুনিক রূপ সজ্জায় সজ্জিত এই নূতন দ্বীপে বেড়াতে আসেন। এমন কি বোর্খা পরিহিতা কাশ্মীরী বধূদেরও এখানে বেড়াতে দেখলাম। দ্বীপের মাঝে বিশ্রামের জন্যে একটি মণ্ডপ আছে। সহরের অন্যান্য আলোগুলি ক্ষীণপ্রভ হোলেও নেহেরু-পার্কের আলোগুলি বেশ উজ্জ্বল। কাশ্মীরে 'নেহেরু' অনেক; এমন কি আলি নেহেরু, মহম্মদ নেহেরু নামও সুপ্রচলিত; তবে এই নেহেরু পার্ক জহরলাল নেহেরুর সম্মানার্থই সৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এর সামনেই খালের অপর তীরে করণসিং বুলেভার্দ-রাস্তা। এই রাস্তা থেকে ডালের খালগুলিতে নামা ওঠার জন্য আগে ছিল কাঠের সিঁড়ি, এখন বেশ পাকাপোক্ত পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ি তৈরী হোয়েছে এবং আরও কতকগুলি হোচ্ছে দেখলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হোয়ে উঠতে আমরা নৌগৃহে ফিরবার জন্যে শীকারায় উঠলাম। অন্ধকার সেদিন প্রায়

সুচী-ভেদ্য, খালি ভয় হচ্ছিল হয়ত বা অন্য কোন শীকারা বা বড় নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খাব, কারণ রাত্রে কেউই আলো নিয়ে নৌকায় যাতায়াত করে না। শীকারা এত হালকা এবং জল থেকে এর মাঝখানের উচ্চতা এত কম (বোধ হয় ছ'সাত ইঞ্চি) যে একটি ধাক্কা খেলেই সেই শীতের রাতে শীতল জলে নৌকাডুবি অবশ্যম্ভাবী। গায়ে শীতবস্ত্রের বাহুল্য ও এত বেশী যে কোন রকমে জলে পোড়লে তাদের ভারেই আর ভাসার সম্ভাবনা থাকবে না।

এর পর একদিন টুরিষ্ট বাসে গিয়েছিলাম এইসব বাগানে। তার গতিপথে প্রথমেই পড়ে চশমাসাহী তারপর নিশাদ, শালিমার ও হারওয়ান। ডালের তীর ধোরেই এ রাস্তা গেছে। দিনে কয়েকবারই এ যাত্রার বাস ছাড়ে। প্রথমেই বাস যায় এ যাত্রার শেষ প্রান্ত হারওয়ানে। এখানে পাহাড়ের কোলে একটি বিরাট বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী হোয়েছে—এর আয়তন প্রায় ১০০০ গজ। পাহাড়ের গা থেকে আসছে হারওয়ান নালা, তার জল এবং প্রায় ২০০ বর্গ মাইল ঢালু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এই হ্রদে জল ধরা হয়। ঐ এলাকায় কোন লোকজন জীবজন্তু যেতে দেওয়া হয় না ; জল কলুষিত হবার ভয়ে। গ্রীষ্মে এ জলাধারের জলের গভীরতা হয় প্রায় ৩৯ ফিট, শীতে প্রায় শুকিয়ে যায়। সারা শ্রীনগর ও সহরতলীর পানীয় জল সরবরাহ হয় এই হ্রদ থেকে। বাঁধটির ওপর দর্শকরা যেতে পারেন। বাঁধের কোলেই একটি বাগান, বৈশিষ্ট কিছু চোখে পোড়ল না।

বাগানটীর বাইরে অনেকগুলি ছেলে বুড়ো কাশ্মীরী মধুচক্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—কারু হাতে ছিল মধু ভরা শিশি। মধুর বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য স্বরূপ এরা চক্র শুদ্ধ মধু বিক্রী করে। পহলগামে এবং এবং সরকারী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ও সরকারী ব্যবসাকেন্দ্রে (State-Emporium) কাশ্মীরী মধু টিনে এবং চাকশুদ্ধ বিক্রী হয়। দাম প্রতি পাউণ্ড ৩৲ টাকা, বাজারে ২৷২৷৷৹ টাকা। জাফরাণ ক্ষেতের আশে পাশের অঞ্চলের মধু জাফরানী রঙ্গের, আর উলার অঞ্চলের মধু চিনির ঘন রসের মত বর্ণহীন। মধুচক্রগুলিও দেখতে সাদা, বাঙ্গালী মৌচাকের মত কালো নয়। বাংলার মধুর মত গন্ধও নেই কাশ্মীরী মধুতে—তাই বিদেশের বাজারে এর কদর আছে। মধু মক্ষিকা পালন এখানের অনেকের বৃত্তি। বনজঙ্গলে বুনো মৌমাছির তৈরী চাক ভেঙ্গে এরা মধু সংগ্রহ করে না; বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাঠের বাড়ীতে পোষ মানায় কর্ম্মক্ষম ভদ্র মৌমাছিদের। তারা চতুর্দ্দিকের প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে রস সঞ্চয় কোরে তাকে ঘনীভূত কোরে মধুতে পরিণত করে। পালক এদের হত্যা না কোরে মধু সংগ্রহ কোরে চাকটি আবার ফিরিয়ে দেয় বাক্সের মধ্যে পরবর্ত্তী সঞ্চয়ের জন্যে।

এখান থেকে ফেরবার পথে একটু এসেই বাস থামলো মাছের ট্রাউট মাছের পালন কেন্দ্রে। এটির ব্যবস্থা, আয়তন, সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সব দিক দিয়েই আচ্ছাবলের মৎস্য পালন

কেন্দ্র থেকে নিকৃষ্টতর মনে হোল। দর্শক দেখলেই একজন কুম্ভকার তার চক্রটি নিয়ে এর প্রবেশ পথে বোসে একতাল মাটি নিয়ে নানা রকমের জিনিষ গোড়তে স্তুরু করে কিছু বখশিসের আশায়। বিদেশী অথবা স্বদেশী সাহেবরা অবাক হোয়ে দেখেন কেমন কোরে একতাল কাদা থেকে মুহূর্ত্তে রূপ নিচ্ছে বিভিন্ন বস্তু একই চক্র থেকে। এখান থেকে শালীমার নিশাদ হোয়ে শ্রীনগরে ফিরবার পথে বাস ডালের তীর ছেড়ে পাশের একটা পাহাড় চড়াই করতে লাগলো, 'চসমা সাহী'তে পৌঁছবার জন্যে।

চড়াইএ পথে ডাইনে একটু দূরে পাহাড়ের ওপর চোখে পোড়ল অতীতকালের অট্টালিকার কিছু ভগ্নাবশেষ—এরই নাম পরীমহল। পরীর দল কখনও এখানে পাখা মেলে আসতো কিনা জানি না; তবে সৌধটির পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ যে পরীদের পক্ষেও লোভনীয় তা বলা যায়। আজ অবশ্য শুধু পোড়ে আছে অতীত ঐশ্বর্য্যের কয়েকখানা কঙ্কাল কালের অট্টহাসির সাক্ষ্যস্বরূপ।

সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাশিকো পিতৃপুরুষদের অনুসরণে হ্রদের ধারে পাহাড়ের কোলে নির্ম্মাণ করান এই পরীমহল জ্যোতিষ বিদ্যার গবেষণার জন্যে এবং গ্রন্থাগার হিসেবে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ছিল এখানের আলোচ্য, তাই হয়ত জনসমাজে এ পরিচিত হোয়েছে পরীমহল নামে। দারাশিকোর গুরু মুল্লাশা'র তত্ত্বাবধানে এখানে গবেষণা চোলত। কেউ

কেউ বলেন—পূর্ব্বে এখানে একটি ঝরণা ছিল, কালক্রমে সেটি যায় শুকিয়ে ; তার ফলে এ জায়গাটা বসবাসের অযোগ্য হোয়ে ক্রমশঃ বর্ত্তমানের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোয়েছে। এখানে সাধারণ দর্শকেরা আজ এমনি যেতে পারে না ; বনবিভাগের অনুমতি নিতে হয়। এর চারটি চত্বরই আজ বনজঙ্গল ও বিষধর সর্প সমাকুল, কাজেই যাওয়া নিরাপদ নয়। এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি ঘিরে তাই কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মনে গড়ে উঠেছে নানা অলৌকিক কাহিনী,—ভূত, দানা, দৈত্য এবং হুরীপরীর বাসভূমি নাকি আজ এই পরিত্যক্ত পরীমহল। 'আহত-গাজী', থিড গ্রাম এবং চশমাসাহী এই তিনদিক থেকে এখানে যাবার তিনটি পায়ে চলা দুর্গম পথ আছে—কিন্তু দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ এটি এত নগণ্য যে কেউ কষ্ট স্বীকার কোরে এখানে যায় না।

বাস ডালের ধারের প্রধান রাস্তা থেকে দেড় মাইল এসে থামলো চশমাসাহী বাগানের সাম্‌নে। ৮০০০ ফিট উঁচু জেবানওয়ান পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট ছবির মত বাগানটী। মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট। এর নির্ম্মাতা জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহাজাহান (১৬৩২-৩৩ খৃঃ অঃ)। চশমাসাহীর পরিকল্পনায় কিছু নূতনত্ব আছে ; প্রথম প্রবেশ-দ্বার অনেকখানি উঁচুতে, কাজেই বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, আর সিঁড়ির দুধারে সামনের দেওয়াল পর্য্যন্ত থাকে থাকে উঠে গেছে নানা গাছ ও ফুল। ছোট্ট প্রবেশ

পথটী পেরিয়ে পর পর তিনটী চত্বরে বাগান ; মাঝ দিয়ে বোয়ে আসছে ঝরণার জল। নিশাদবাগের ছোট সংস্করণের মতই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে জলধারা ছোট প্রপাতের মত পোড়ছে, মাঝে মাঝে ফোয়ারা। পাহাড়ের গায়ে শেষ চত্বরটীর মাঝে একটি মার্বেবল ঘেরা কুণ্ডে অবিরাম জলধারা উৎসারিত হোয়ে বাগানের মাঝ দিয়ে বোয়ে যাচ্ছে। এই জলধারাটির এ অঞ্চলে অত্যন্ত সুনাম। সোনার চেয়েও মূল্যবান নাকি এর জল। সব রকম বদহজম অম্বল অবিলম্বে আরাম করে এই প্রাকৃতিক রসায়ন। সহরের অনেকেই এখান থেকে পানীয় জল নিয়ে যান, আর যাত্রীরা এর গুণ শুনে শীতেও সুস্বাদু শীতল জল পেট ভরে পান করেন। দ্বিতীয় চত্বরে একটি কাঠের বারদোয়ারী আছে ; সেখান থেকে ওপরে পাহাড়ের কোলে ফোয়ারা সাজান ফুল বাগান, আর নীচে নিথর কালো ডালের জল বড় সুন্দর দেখায়। এই বারদোয়ারীর মাঝ দিয়ে জলের নালাটি গিয়ে বেশ উঁচু থেকে প্রথম চত্বরটিতে পোড়ছে নানাভাবে খোদাই করা পাথরের ওপর দিয়ে। এখানে কোন দোকানপাট নাই, তাই দর্শকেরা নিজেদের চা খাবার সঙ্গে এনে বাগানটীতে খাওয়া দাওয়া করেন। চশমাসাহী শ্রীনগরের সব চেয়ে কাছে (৫½ মাইল) সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাগান, তাই এখানে যাত্রী ও প্রেমিকদের ভীড় একটু বেশী।

এখানেই সন্ধ্যা হোল—এখান থেকে ডালের ওপর সূর্য্যাস্তের

সৌন্দর্য্য ভিন্ন রকমের। ডালের বুকে বোসে মনে হয় আমি বুঝি এর বিরাটত্বের মধ্যে হারিয়ে গেছি, কিন্তু এখান থেকে দ্রষ্টার মত দূর থেকে দেখা যায় স্রষ্টার সে সৌন্দর্য্যলীলা—নীলের বুকে নানা রংএর অপূর্ব্ব আতসবাজী আর ডালের কালো জলে তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সেদিন প্রকৃতির এই শান্ত শ্যামল পরিবেশের মধ্যে দেখলাম রুদ্রের তাণ্ডবলীলা। পাশের পাহাড়টীর বুকে কি ভাবে আগুন লেগেছে। দিনের আলোয় দেখেছিলাম শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সন্ধ্যায় দেখলাম অন্ধকারের কালোবুকে দাবাগ্নির লেলিহান লীলা, লোল জিহ্বার বিরাট বিস্তার। সন্ধ্যার কালো আকাশখানা সেখানে লাল হোয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে গাছ ফাটার আওয়াজ আসছে। পাহাড়ের ওপর এই দাবাগ্নি আপনিই জ্বলে; আপনিই নেবে; কারণ সেই খাড়া পাহাড়ে যান্ত্রিক যানবাহন যাবে না, জলও নাই। অনেক সময় আশেপাশের জঙ্গল কেটে এর বিস্তার বন্ধ কোরতে হয়।

উপসংহার

অন্ততঃ মাসখানেক থাকলে কাশ্মীরের সব দ্রষ্টব্য একরকম দেখা যায়। বিভিন্ন ঋতুতে এর বিভিন্ন রূপ তা পূর্ব্বেই বোলেছি। কাহিনী বেশ দীর্ঘ হোয়েছে, কাজেই এবার সমাপ্তির ছেদ টানতে হবে। তার পূর্ব্বে কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজনৈতিক গোলযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমার কি মনে হয় পাঠকদের শুধু সেটা জানিয়ে রাখতে চাই।

ইংরেজ ভারত ছাড়ার সঙ্গে কাশ্মীর চেয়েছিল স্বাধীনতা এ বিষয়ে মহারাজা, মুসলিম কনফারেন্স ও ন্যাশান্যাল কনফারেন্স সকলেই প্রায় একমত ছিলেন এবং ভারত বিভাগের পর কাশ্মীরের সকল পক্ষই সেই চেষ্টায় ছিলেন। বিরোধ ছিল শুধু নেতৃত্বের। মহারাজা হরিসিং তাই তাড়াতাড়ি পাকিস্থানের সঙ্গে স্থিতাবদ্ধ চুক্তি কোরে নিজের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। জনাব জিন্নাও তাঁকেই তোয়াজ কোরে বোললেন কাশ্মীর কোনদিকে যোগ দেবে তা মহারাজই স্থির কোরবেন কারণ তিনিই রাজ্যের মালিক, সাধারণ প্রজার এ নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের সভাপতি শেখ মহম্মদ আবতুল্লা খোলাখুলি বোল্লেন আমরা ভারত বা পাকিস্থান কার সঙ্গে যোগ দোব অথবা "স্বাধীন থাকব" প্রজাসাধারণই তা ঠিক কোরবে এবং তাদের সে অধিকার পেতে হোলে আগে মহারাজকে গদিচ্যুত কোরতে হবে; কাজেই তিনি "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ কোরলেন। এই সময়ে (১৯৪৭ সালের জুন জুলাইএ) কাশ্মীরী পণ্ডিত সম্মেলন দাবী করেন যে কাশ্মীর হিন্দুস্থান গণপরিষদে যোগ দিক; অমনি মুসলীম কনফারেন্স মহারাজাকে জানান তাহোলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা কোরবে (আবতুল্লা সাহেবের বিরোধীদল হিসেবে এরা তখন কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনে যোগ না দিয়ে মহারাজের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং পাকিস্থানের জন্যে প্রচার চালাচ্ছিল)। তাদের দাবী

হোল কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিক, কমপক্ষে "স্বাধীনতা ঘোষণা করুক এবং নিজস্ব গণপরিষদ আহ্বান করুক।" অপর পক্ষে পাকিস্থানকেও খুসী কোরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা আবদুল্লা সাহেবও যথেষ্ট করেন; তিনিও ঘোষণা করেন "পাকিস্থান যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রজাসাধারণের হাতে থাকবে, কোন দেশীয় রাজ্য কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকারী জনসাধারণ, তা হোলে আমরা পাকিস্থান রাষ্ট্রে যোগ দোব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা কোরব।" কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আবদুল্লা সাহেব লাহোরে ও শ্রীনগরে পাকিস্থানের প্রধানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে জিন্নাসাহেব হিটলারের ঝঞ্চা বাহিনীর অনুকরণে নোঙ্গরবিহীন এই নৌকাটীর ওপর ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন। কাশ্মীরের মহারাজের প্রায় পনের হাজার সৈন্য হয়ত বা এ আঘাত সামলাতে পারতো কিন্তু শেখ আবদুল্লার আন্দোলনে তখন সমগ্র মুসলমান সমাজ হিন্দু ডোগরা রাজের ওপর বিরূপ ও বিদ্রোহী হোয়ে উঠেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের এবং পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, আসফ আলি প্রভৃতির সাহায্যে ও সহযোগীতায় শাসন ভাঙ্গার নেশা তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে—সে আগুনে ঘৃতাহুতি পোড়ল হিন্দুরাজ ধ্বংসের বিদ্বেষ। "ডোগরা রাজ খতম্ করো" ছিল বিদ্রোহীদের ধ্বনি।

দেশব্যাপী এই বিদ্রোহ বহ্নি দমন কোরতে মহারাজের সব শক্তি তখন ব্যস্ত। এমন সময় গান্ধীজী ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে কাশ্মীরে এসে মহারাজের সঙ্গে দেখা কোরে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র কাককে পদচ্যুত কোরতে বলেন। ভারতের ভাগ্য বিধাতা গান্ধীজীর আদেশে প্রধান মন্ত্রীর পদচ্যুতি, বিদ্রোহী নেতা শেখ আবদুল্লার মুক্তি (১৯৪৭, ২৯শে সেপ্টেম্বর), পলাতক নেতা গোলাম মহম্মদ বক্সীর কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তনে অনুমতি ও বিদ্রোহীদের কারা-মুক্তির ফলে দেশে রাজশক্তি দুর্ব্বল হোল, আবদুল্লা সাহেবের প্রতিপত্তি বাড়লো। মহারাজা তখনও ভাবছিলেন শেখ আবদুল্লাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর কাশ্মীর ও তিনি সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এই সময় তীব্রবেগে ঝঞ্চার মত হানাদারের দল পুঞ্চ মজঃফরাবাদ প্রভৃতি এলাকায় আঘাত হানলো। হিন্দু নিধন যজ্ঞ সুরু হোল, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ অবাধে চললো—বহু প্রজা ও মুসলমান পুলিশ এবং সৈন্য এতে যোগ দিলে। ফলে মহারাজার পক্ষে হানাদারদের বাধাদান অসম্ভব হোয়ে পড়লো, আবদুল্লাও দেখলেন তার স্বপ্ন বুঝি স্বপ্নই থেকে যায়। কাশ্মীরের সার্ব্বভৌমতার স্বপ্ন বর্ব্বরতার বিভীষিকার রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে গেল। পাকিস্থানের কবলে গেলে শেখ আবদুল্লা বা তার ন্যাশান্যাল কনফারেন্স যে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যেতেন একথা অত্যন্ত স্পষ্ট, কারণ মুসলীম লীগের সঙ্গে ছিল তাঁর বিরোধ। কাজেই মহারাজা এবং তাঁর

বিদ্রোহী প্রজার নেতা শেখ আবদুল্লা একসঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত সরকারের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব লৌহমানব সর্দ্দার প্যাটেল অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাহায্য এবং সলাপরামর্শ দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত বোলে স্বীকার কোরে নেন।

এই পরিবেশের মধ্যে কাশ্মীরের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হবার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে সে যুক্ত হোল। এর পর হানাদারদের সমতলভূমি থেকে তাড়িয়ে সম্পূর্ণ বিজয় যখন প্রায় মুষ্টিগত তখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পররাজ্য আক্রমণের অভিযোগ এনে সামরিক শক্তি সংযত কোরলে (১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে যুদ্ধ বিরতি হয়)। পাকিস্থান তখন সম্পূর্ণ অস্বীকার কোরলে তার যোগাযোগ হানাদারদের সঙ্গে, কিন্তু ক্রমে দর কষাকষির সময় দেখা গেল পাকিস্থানই প্রকৃত পক্ষ। গত পাঁচ বছর ধোরে এই দর কষাকষির দৌড় দেশবাসী জানেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হোয়ে চুক্তিতে এক সর্ত্ত জুড়ে দেন যে ভবিষ্যতে কাশ্মীরবাসীরা গণভোটে স্থির কোরবে তারা পাকিস্থান বা ভারতে যোগ দেবে। বলাবাহুল্য দুর্য্যোগের সেই দুর্দ্দিনে কাশ্মীরের মহারাজা বা আবদুল্লা সাহেবের কোনও সর্ত্ত আরোপ কোরে সাহায্য চাইবার ক্ষমতা ছিল না। পরে প্রকাশ পেয়েছে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের কূটকৌশলে নেহেরুজী উদারতার

অজুহাতে এই ফাঁদে পা দিয়েছেন। ভারতের সৈন্য ও সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্থানের কবল থেকে ভারতেরই অংশকে রক্ষা কোরে আবার তাকে বলা যে এবার কোন দিকে যাবে ভোট দিয়ে স্থির করো, এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাহাদুরী কুড়োন যেতে পারে, কিন্তু সেটা যে চরম রাজনৈতিক নির্ব্বুদ্ধিতা একথা অতি সাধারণ মানুষও বোঝে।

এখন দেখা যাক পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবিত গণভোটই যদি নেওয়া হয় তবে শতকরা ৮০ জন মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্থান কোন দেশে যোগ দেবে। অনেকেরই ধারণা কাশ্মীরের মুসলমান স্বাভাবিক ভাবেই ভোট দেবে পাকিস্থানের পক্ষে। অতীতের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দেয়। কিন্তু আমার ধারণা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীরী মুসলমান পাকিস্থানে যোগ দেবার পক্ষে ভোট দেবে না। অবশ্য ভোটের মুখে ধর্ম্মের জিগীর তুলে মুসলমান ঐক্যর ধুয়ো তুল্লে কাশ্মীরের মুসলমান কি কোরবে বলা মুস্কিল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান যদি নষ্ট না হয় তবে কাশ্মীরের মুসলমান ভারতের দিকেই থাকবে, তার কারণ ভারত ইতি-মধ্যে স্বীকার কোরে নিয়েছে যে (ক) কাশ্মীর কার্য্যতঃ পৃথক রাজ্য, কারণ তার পৃথক পতাকা, পৃথক শাসনতন্ত্র ও পৃথক রাষ্ট্রপ্রধান। (খ) হিন্দুরাজাকে অপসারিত কোরে মুসলমান জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ কোরেছে ভারতবর্ষ। (গ) ভারতের শাসনতন্ত্রের আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না

করা সত্ত্বেও ভারতের মত প্রতিপত্তিশালী এক বন্ধু রাষ্ট্র তার আপদ বিপদে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে উদগ্রীব। (ঘ) পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত হোলে কাশ্মীরে বিদেশী যাত্রী আসবে মাত্র করাচী, লাহোর থেকে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে থাকলে তার বহু নাগরিক প্রতি বৎসর যাবে এখানে, যার ফলে অধিকতর অর্থাগম হবে কাশ্মীরবাসীদের।

পাকিস্থানে যোগ দেওয়ার অর্থ ঃ—(ক) বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বদলে করাচী থেকে শাসিত হওয়া এবং নিজেদের স্বতন্ত্র লুপ্ত হওয়া। (খ) দরিদ্রতর ও ক্ষুদ্রতর দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বিদেশী অতিথির সংখ্যা হবে স্বল্পতর, ফলে অর্থাগম হবে অল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র হবে অপরিসর। (গ) পাকিস্থানী পরিচালিত আক্রমণে কাশ্মীরের হিন্দু ও মুসলমান রমণী ধর্ম্মনির্ব্বিচারে ধর্ষিতা ও অপমানিতা হোয়েছে, সকলের গৃহই অগ্নিদগ্ধ হোয়েছে, কাজেই পাকিস্থানের মুসলীম প্রীতির ওপর কাশ্মীরি মুসলমানদের আর বিশেষ আস্থা নাই। ভারতের সাহায্যে কাশ্মীর তাদেরই পূর্ণ প্রতিনিধি নিয়ে আইন সভা গঠন কোরেছে, ডোগরা রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হোয়েছে, পৃথক সত্ত্বার স্বীকৃতি স্বরূপ নিজস্ব পতাকা পেয়েছে, সাধারণ কৃষক অবস্থাপন্ন কৃষকের কাছ থেকে (যারা অধিকাংশই হিন্দু) বিনা খেসারতে কেড়ে নেওয়া জমির মালিক হোয়েছে বিনামূল্যে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সৈন্য বিভাগে হিন্দু ডোগরা রাজপুতদের আধিপত্যের বদলে মুসলমানদের প্রভাবই এখন সর্ব্বাধিক, কাজেই কিসের লোভে

কাশ্মীরবাসী ভারতকে ছেড়ে পাকিস্থানে যাবে? মুসলমান প্রীতির জন্যে? ভারতে যোগ দিলেও ত তার হানি হবে না, বরং তাতে সে থাকছে স্বয়ং শাসিত মুসলমান রাজ্য হিসাবে। পাকিস্থানে যোগ দিলে করাচীর কুক্ষাগত হোতে হবে সম্পূর্ণভাবে।

এখন দেখা যাক কাশ্মীরের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল প্রজা পরিষদের আন্দোলনের মূল কথা কি? প্রজাপরিষদের দাবী ছিল—'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান!' অর্থাৎ বিনা-সর্ত্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোয়েছে এই জন্যেই ভারত কাশ্মীরের রক্ষার জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় কোরছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনানীরা প্রাণ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত কাশ্মীরকে নিজের বোলে দাবী জানিয়েছে—অথচ সেই কাশ্মীরের বা ভারতের কোন প্রজা বা তাদের দল যদি ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির দাবী জানায় তবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় পুলিশ ও অস্ত্র পাঠিয়ে তাদের সাজা দেন কেন, গুলী চালনার আদেশ দেন কেন তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। প্রজা-পরিষদ দাবী কোরেছিল যে কাশ্মীরের পৃথক সত্ত্বা থাকতে পারে না, সে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা পূর্ব্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির মতই বিনা সর্ত্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোক, আর ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের প্রধান ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন কাশ্মীরের পৃথক শাসনতন্ত্র, পৃথক পতাকা, পৃথক রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি হোলেন জাতীয়তা-বাদী, ভারতের পরম সুহৃদ আর প্রজা-পরিষদ হোল

সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছেদ[illegible]ী ! ভারতের গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত নাগরিকের সাধারণ অধিকার কাশ্মীরবাসী লাভ করুক এবং ভারতের উচ্চতম আদালত কাশ্মীরের উচ্চতম আদালত বোলে স্বীকৃত হোক, এ দাবীও কংগ্রেস সরকারের চোখে অপরাধ এবং এই অপরাধের ফলে সহস্র সহস্র কাশ্মীরবাসীকে নির্য্যাতিত ও কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং ভারতের সরকার তাতে সাহায্য করেছিলেন। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! কিন্তু একটা মিথ্যা ঢাকতে যেমন মিথ্যার জাল বুনতে হয়, একটা ভুল ঢাকতে তেমনি অনেক ভুল কোরতে হয়। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ বোলে স্বীকার কোরেও তার পুনরুদ্ধার না করা এবং তার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরজায় কান্নাকাটি করা ক্লীব নীতির পরিচায়ক; কিন্তু তা যখন হোয়েই গেছে এবং এই অন্তর্ভুক্তিকে যখন আবার গণভোটের অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হোতেই হবে, তখন কংগ্রেসী সরকারের বর্ত্তমান নীতি ব্যতীত বোধ হয় দ্বিতীয় পথ নাই। পাকিস্থানে গেলে কাশ্মীর যে সুবিধা পেত তার চেয়ে বেশী ঘুষ না দিলে সে কেন এদিকে আসবে ? এখানে নীতি ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে বাস্তব রাজনীতিকে স্বীকার কোরতে হবে অর্থাৎ কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতিকেই শ্রেয় বোলে মানতে হবে। কিন্তু নিজেদের প্রথম ভুল স্বীকার কোরবার সাহস নাই বোলে পরবর্ত্তী ভুলগুলোও সমর্থন কোরতে হোচ্ছে সত্যবাদীদের মিথ্যাবাদী বোলে, জাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রদায়িক বোলে।

প্রজা-পরিষদের আর একটা ভয় এই যে গণভোটে যদি কাশ্মীরী মুসলমান পাকিস্থানে যেতে চায় তবে জম্মু এবং লাদাক প্রদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ৯ লক্ষ হিন্দু ৩৬ হাজার বৌদ্ধ এবং কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘিষ্ঠ এক লক্ষ হিন্দুদের কি হবে? কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ আজও পাকিস্থানের কবলে এবং সেখানের সব অধিবাসীই আজ মুসলমান, তাদের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার চৌদ্দ লক্ষ মুসলমানের অধিকাংশ যদি পাকিস্থানে যোগ দিতে চায় তবে কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে জম্মু ও লাদাককেও যেতে হবে পাকিস্থানের কব্জায়। ফলে তাদের স্ত্রী-পুত্র ও ধর্ম্ম নিয়ে দেশত্যাগী হোতে হবে। তাই এরা দ্বিতীয় দাবী তুলেছিল কাশ্মীর উপত্যকা যদি রাজী না হয়—তাকে বাদ দিয়ে জম্মু ও লাদাক সম্পূর্ণভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। এ আন্দোলনকে আপাতদৃষ্টিতে বিভেদ সৃষ্টিকারী বলা চলে, কিন্তু আন্দোলনের অন্তরালে আছে এই আশঙ্কা যা মোটেই অমূলক নয়। অন্য পক্ষে এ আন্দোলনে কাশ্মীরের জাতীয়তা-বাদী মুসলমান সম্প্রদায় যে ক্ষুণ্ণ হবেন এও স্বাভাবিক। কাজেই ভবিষ্যতে গণভোটের দাবী থাকলে সমগ্র সমস্যাটী বড় জটিল এবং এর সমাধান জটিলতর হোয়ে উঠবে। যে অংশ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত বোলে ভারত ও সে দেশের গণপরিষদ স্বীকার কোরে নিয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে ভারত তার রক্ষার পূর্ণ দায়ীত্ব নিয়েছে, সে দেশকে আবার গণভোটে এ বিষয় স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া উদারতার পরিচয় হোলেও রাজনৈতিক

অদূরদৃষ্টিতার পরিচায়ক। সতী সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর আবার প্রজার দাবীতে সতীত্ব প্রমাণের চেষ্টায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হারিয়েছিলেন। কোন কিছুরই বাহুল্য ভাল নয়।

এর ওপর কাশ্মীরের পৃথক শাসনতন্ত্র ও পতাকা স্বীকার কোরে ঘুষ দেওয়ার যে অপচেষ্টা হোয়েছে তাতে সমস্ত ব্যাপারটী অধিকতর জটিল করা হয়েছে। ভারতের অন্তর্ভুক্ত অংশে কিভাবে আর একটী পৃথক জাতীয় পতাকা থাকতে পারে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। ৪ঠা ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের রাজ্যপাল সম্মেলনে কাশ্মীরের রাষ্ট্রপ্রধান সর্দ্দার-ই-রিয়াসৎকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হোয়েছিল। এই বিভেদমূলক ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত ঘটনা স্রোতকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই জানেন।

প্রজা পরিষদকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হোয়েছে এবং কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশনে হায়দারাবাদে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ও সেখ আবদুল্লা শুধু এ বিষয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরেছেন কিন্তু এদের অপরাধটী কি তা স্পষ্ট কোরে বোলতে পারেন নাই। প্রজা পরিষদেও মুসলমান নাগরিক সভ্য আছেন; হয়ত আবদুল্লা সাহেবের ন্যাশনাল কনফারেন্সে যতজন হিন্দু সভ্য আছেন, তার চেয়ে শতকরা মুসলমান সভ্য এদের বেশী। (স্মরণ রাখা দরকার যে শেখ আবদুল্লা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুর সভ্য হবার অধিকার ছিল না)। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি ভারতে যুক্ত হওয়ায়

যদি কোন আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি না হোয়ে থাকে তবে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে বিনাসর্ত্তে অন্তর্ভুক্তির দাবীর অপরাধ ও অসুবিধাটা কোথায় ?

প্রজা-পরিষদ ১৯-৩-৫২ তারিখে ভারত-রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদকে এক স্মারক লিপিতে তাদের দাবী ও অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার দাবী করেন—তা নিষ্ফল হওয়ার পরে সত্যাগ্রহ শুরু হয় নভেম্বর মাসে (১৯৫২)। এই স্মারক লিপিতে শেখ আবদুল্লা সরকারের নামে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে বলা হয় যে—(১) ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীকে বর্জ্জন কোরে কাশ্মীরে উর্দ্দু গ্রহণ করা হোয়েছে—সরকারী রাজকর্ম্মও এখন উর্দ্দুতেই করা হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করা হোয়েছে। কাশ্মীরে সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র "সংস্কৃত গবেষণা কেন্দ্র" তুলে দিয়ে আরবী শিক্ষার জন্য 'দার-উল-উলাস্' প্রতিষ্ঠা করা হোয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টা হোয়েছে। (২) সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার বদলে জাতি এখন মাপকাঠি। চাকরীর বিজ্ঞাপনে "কেবলমাত্র মুসলমানরাই আবেদন করিবেন" বোলে বিজ্ঞাপিত থাকে। (৩) হিন্দু এবং জম্মুর অধিবাসীদের কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ দেওয়া হয় না ; তা'দিকে অপসারিত কোরে কাশ্মীরী মুসলমানদের বসান হোয়েছে। এমন কি পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন কমিটীতে সাতজন সদস্যের মধ্যে একজনও

জম্মুবাসী গ্রহণ করা হয় নাই। (৪) মহারাজা রণবীর সিং দ্বারা দেব-সম্পত্তি পরিচালনার্থ প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম্মার্থ ট্রাষ্ট' তহবিল বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছে। দেব খরচ জন্য ঐ তহবিল থেকে কোন টাকা দেওয়া হয় না। (৫) নয়া-কাশ্মীর গঠনের নামে জম্মুর বিভিন্ন জেলায় হিন্দু প্রধান অঞ্চলকে টুকরো টুকরো কোরে এমনভাবে গঠন করা হোয়েছে—যাতে ঐ এলাকায় হিন্দু গরিষ্ঠতা না থাকে। (৬) জম্মুতে সাত লক্ষ 'কানাল' উর্ব্বর জমি থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের হিন্দু ও শিখ উদ্‌বাস্তুদের জম্মুতে জায়গা দেওয়া হয় নাই এবং ঐ সব জমি প্রিয় পাত্রদের বিলি কোরে সেই টাকা মুসলমান উদ্‌বাস্তু তহবিলে জমা করা হোয়েছে। হিন্দু শিখদের ওপর এমন ব্যবহার করা হয়—যাতে আর্থিক দুর্দ্দশা ও অন্যান্য অসুবিধায় পোড়ে তারা ভূপাল, আলোয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি রাজ্যে চোলে যেতে বাধ্য হোয়েছে। এমনি আরও অনেক অভিযোগের ফিরিস্তি আছে, কিন্তু তার কোন সদুত্তর প্রধান মন্ত্রীদের কেউ-ই দেন নাই। ২৪শে জানুয়ারী (১৯৫৩) তারিখে দিল্লীর এক বক্তৃতায় আবদুল্লা সাহেব শুধু বোলেছেন "উর্দ্দু মুসলমানদের ভাষা নয়, ভারতের একটা প্রধান ভাষা এবং পূর্ব্বেও উর্দ্দু তে রাজকার্য্য চোলত।"

মুসলমানদের যাবতীয় সুখ সুবিধা হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ কোরে দিলেও সেটা হবে জাতীয়তা আর হিন্দুদের কোন ন্যায্য সুখ সুবিধার কথা বোল্লেই সেটা হবে সাম্প্রদায়িকতা—এই অদ্ভুত

জাতীয়তা মার্কা রাজনীতি দ্বারাই আজ ভারতের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি পরিচালিত। অবশ্য একথা ঠিক যে এর ফলেই শেখ আবদুল্লা ভারতের বন্ধু, এর ফলেই পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্যতম আন্তর্জাতিক অপরাধ কোরেও বন্ধু রাষ্ট্ররূপে গণ্য।

পাকিস্থানে যোগ না দেবার জন্যে কাশ্মীরের একটী পৃথক ইস্‌লামীস্থানে পরিণত করা হোয়েছে—ভারতেরই সৈন্য ও অর্থবল দিয়ে। কিন্তু সত্য স্বপ্রকাশ। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি পণ্ডিত নেহেরুর সমস্ত প্রচার, শেখ আবদুল্লার সমস্ত ধাপ্পা এবং ধমক ব্যর্থ কোরে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সত্য প্রকাশিত হোল। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পৃথক রাষ্ট্ররূপে পরিচালিত হোতে চোলেছে, এই কথা ভারতের জনগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য বাংলার তেজস্বী সন্তান বাগ্মী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে আন্দোলন আরম্ভ করেন (হিন্দু মহা-সভা, জনসংঘ ও রামরাজ্য পরিষদ সংযুক্ত ভাবে এই আন্দোলন করেন)। এই আন্দোলনের ফলে আবদুল্লা সরকার শ্যামা-প্রসাদ বাবুকে লখিমপুরে বন্দী করেন (১১ই মে) এবং বন্দী দশাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (২২শে জুন, ৫৩)। পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদের বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের জনমন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, আবদুল্লা সরকারের কার্য্যকলাপ

সম্বন্ধে তদন্ত দাবী কোরলো কিন্তু বন্ধুবৎসল প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু রক্তচক্ষু দেখিয়ে সে দাবী উপেক্ষা কোরলেন। নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে কিন্তু মাত্র দেড় মাস পরেই শেখ আবদুল্লার সহকর্মী ও সহচরবর্গ প্রকাশ্যে ঘোষণা কোরতে বাধ্য হোলেন যে শেখ আবদুল্লা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং দূর্নীতি স্বজনপোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা দেশের শাসনযন্ত্রের কাঠামো এমন এক জঘন্য অবস্থায় এনেছিলেন যে গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হোয়ে উঠেছিল। তাই নেহেরুজীর প্রেমপুষ্ট এই কাশ্মীরী ব্যাঘ্রটিকে (শের-ই-কাশ্মীরী) রাতারাতি বন্দী কোরতে বাধ্য হোলেন (৮ই আগষ্ট) সর্দার-ই-রিয়াসৎ করণ সিং। শেখ আবদুল্লারই অন্তরঙ্গ সহচর বক্সী গোলাম মহম্মদ নূতন কোরে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বক্সী গোলাম মহম্মদের পরিচালনায় কাশ্মীরে আজ এই মতই প্রবল হোয়ে উঠেছে যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হোয়েছে, এ নিয়ে আর ভোটাভুটি ঝগড়া চোলবে না। বর্ত্তমানে অনেক সরকারী ভবনে ভারতীয় পতাকাও তোলা হয়। জম্মুর হিন্দু এবং লাদাকের বৌদ্ধরা বক্সী সাহেবকে সমর্থন করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ শের শেখ আবদুল্লা এবং তার অনুচরের দল আজ নখ-দন্তহীন। পাকিস্থানের দাবী কিন্তু আজও ক্ষীণ হয় নাই, গণভোটের প্রতিশ্রুতিতে ভারত আজও আবদ্ধ। দেখা যাক চক্রীর চক্র কাশ্মীরের ভাগ্যচক্রকে কোন পথে চালিত করে।

সমাপ্ত